রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানার্জন প্রতিটি মোসলমানের উপর ফরয। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৩)

بَعْضُ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ مَعْرِفَةِ دِيْنِهِ

فِيْ ضَوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়

সংকলনে:

মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن
بعض ما يحتاجه المسلم في معرفة دينه./ مستفيض الرحمن عبدالعزيز.-
حفر الباطن، ١٤٣٣هـ
٩٦ ص؛ ١٤ × ٢١ سم
ردمك : ٤ - ١٦ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١- الإسلام ٢- الشريعة الإسلامية أ- العنوان
ديوي ٢١٠ ١٤٣٣/١١٧١

رقم الإيداع : ١١٧١ /١٤٣٣
ردمك : ٤ - ١٦ -٨٠٦٦- ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م

একটি অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৩০/১১/১১

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক ২. ছোট শির্ক ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২) ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম ৭. মদপান ও ধূমপান
৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ৯. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১০. গুনাহ্'র অপকারিতা ১১. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১২. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা ১৩. সাদাকা-খায়রাত
১৪. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৫. জামাতে নামায পড়া
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান
১৮. সকাল-সন্ধ্যা ও প্রত্যেক নামায শেষে যা বলতে হয়
১৯. গুনাহ্'র চিকিৎসা

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

লেখকের কথা:

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

মূলতঃ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যানার বানানোর উদ্দেশ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখার জন্য আমি আমার উপরস্থের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হই। যা যে কোন মোসলমানের জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য। পরবর্তীতে কিছু শুভানুধ্যায়ী ভাইদের আবেদন ক্রমে তা পুস্তিকা রূপে প্রচারের চিন্তা-ভাবনা করি। আশা করি যে কোন মোসলমান এ থেকে কম-বেশি উপকৃত হতে পারবে। আর তাই হবে আমাদের একান্ত কামনা।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে

আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

فضل طلب العلم :

ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত:

১. আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। (মুজাদালাহ্ : ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ তুমি ওদেরকে বলে দাও। যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তারা উভয় কি একই সমান? (যুমার : ৯)

২. ধর্মীয় জ্ঞানার্জন আল্লাহ্ভীতি অর্জনের এক বিশেষ মাধ্যম:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মাঝে যারা সত্যিকারার্থে জ্ঞানী তারাই মূলতঃ তাঁকে ভয় করে। (ফাত্বির : ২৮)

৩. ধর্মীয় জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরয:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾

অর্থাৎ অতএব তুমি জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং তুমি ও তোমার মু'মিন পুরুষ ও মহিলা উম্মতের সমূহ গুনাহ্'র জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। (মুহাম্মাদ : ১৯)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরয। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৩)

৪. ধর্মীয় জ্ঞান মূলত: কল্যাণই কল্যাণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যখনই যার কল্যাণ করতে চান তখনই তিনি তাকে তা একমাত্র দিয়ে থাকেন:

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারোর কল্যাণ চাইলে তিনি তাকে ধর্মীয় প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। (মুস্লিম, হাদীস ১০৩৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৯)

৫. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের জন্য কোন পথ পাড়ি দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন:

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থাৎ কেউ ধর্মীয় জ্ঞান শেখার জন্য কোন পথ অতিক্রম করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশ্তাগণ জ্ঞান পিপাসুদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা নিজেদের ডানাগুলো জমিনে বিছিয়ে দেন। উপরন্তু জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আকাশ ও জমিনের সকল কিছু এমনকি পানির মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। একজন আলিমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর উপর তেমন যেমন চন্দ্রের মর্যাদা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর। আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ কখনো কোন দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা মিরাস হিসেবে রেখে যান না। বরং তাঁরা একমাত্র রেখে যান ওহীর জ্ঞান। যে তা গ্রহণ করবে সেই তো হবে বড়ো ভাগ্যবান। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২২)

৬. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا

অর্থাৎ দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তাতে যা রয়েছে। তবে আল্লাহ্'র যিকির ও তাঁর আনুগত্য, আলিম এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণকারী। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪১৮৭)

৭. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ সমতুল্যঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান শেখা বা শেখানোর জন্য আমার মসজিদে আসলো সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পথের একান্ত মুজাহিদ সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসলো সে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকা লোকের মতো। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৬)

সমাপ্ত

أركان الإسلام الخمسة بأدلتها :

দলীলসহ ইসলামের পাঁচটি রুকন:

মানব সমাজের সমূহ কল্যাণ একমাত্র সত্য ধর্ম পালনের উপরই নির্ভরশীল। আর এর প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এতো বেশি যতটুকু না তাদের প্রয়োজন খাদ্য, পানি ও বায়ুর প্রতি। কারণ, মানুষের কর্মকাণ্ড তো সাধারণত দু' ধরনের। তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা অকল্যাণ। আর সর্বদা নিরেট কল্যাণ সংগ্রহ করা ও সমূহ অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষাই তো যে কোন সত্য ধর্ম দিয়ে থাকে। আমাদের ধর্মের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান। ইসলাম বলতে ধর্মের কিছু প্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়। যা আমাদের ধর্মের জন্য পাঁচটি। আর ঈমান ও ইহ্সান বলতে ধর্মের কিছু অপ্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়। যা আমাদের ধর্মের জন্য পর্যায়ক্রমে ছয়টি ও দু'টি। সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম ধার্মিকের সংখ্যা বেশি। তারপর মু'মিন এবং তারপর মু'হসিন। আর বিশেষত্বের দিক দিয়ে সব চাইতে ব্যাপক হচ্ছে মু'হসিন। তারপর মু'মিন এবং তারপর মুসলিম। কারণ, যে মু'হসিন সে অবশ্যই মু'মিন ও মুসলিম। আর যে মু'মিন সে অবশ্যই মুসলিম। এর বিপরীতে যে কোন মুসলিম সে মু'মিন কিংবা মু'হসিন নাও হতে পারে। তেমনিভাবে যে কোন মু'মিন সে মু'হসিন নাও হতে পারে।

ইসলাম মানে আল্লাহ্'র তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা এবং শির্ক ও মুশ্রিক, কুফর ও কাফির থেকে অবমুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾

অর্থাৎ কেউ যদি সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে তা হলে সে যেন দৃঢ়ভাবে এক মজবুত হাতল হস্তে ধারণ করলো। কারণ, সকল কর্মকাণ্ডের পরিমাণ তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই এখতিয়ারে। (লুক্বমান : ২২)

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর। সেগুলো হলো:

ক. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র রাসূল।

খ. নামায কায়িম করা।

গ. যাকাত আদায় করা।

ঘ. হজ্জ করা।

ঙ. রামাযানের রোযা রাখা। (বুখারী, হাদীস ৮ মুসলিম, হাদীস ১৬)

উক্ত রুকনগুলো সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. শাহাদাতাইন:

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে এ কথা কায়মনোবাক্যে স্বীকার করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। তিনি ছাড়া দুনিয়াতে আর যত ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা করা হচ্ছে তা সবই বাতিল। এর আবার দু'টি রুকন রয়েছে যা হলো:

ক. আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা।

খ. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যে, তিনি যে কোন ব্যাপারেই যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে ধারণা করা। তিনি যা আদেশ করেছেন তা যথাসাধ্য পালন করা। তিনি যা করতে নিষেধ করেছে তা হতে একেবারেই বিরত থাকা। একমাত্র তাঁর বাতলানো শরীয়ত অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করা।

২. যথাযথভাবে পাঁচ বেলা নামায নিয়মিত কায়িম করাঃ

প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই এ নামাযগুলো পড়া ফরয। নিরাপদ ও আতঙ্কিতাবস্থায়, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, নিজ এলাকা ও অন্য যে কোন জায়গায় তথা সর্বাবস্থায় তা পড়তে হয়। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংখ্যা ও ধরনে শরীয়তে কিছু ছাড় রয়েছে। নামায হচ্ছে নূর, ধর্মের বিশেষ স্তম্ভ, আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দাহ্'র মাঝে সম্পর্কোন্নয়নের একটি বিশেষ মাধ্যম। নামাযের যেমন একটি বাইরের দিক তথা দাঁড়ানো, বসা, রুকু', সাজ্দাহ্ এমনকি আরো অন্যান্য কথা ও কাজ রয়েছে তেমনিভাবে তার একটি ভিতরের দিক তথা অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব, মর্যাদা, আনুগত্য, ভয়, ভালোবাসা, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা ইত্যাদিও রয়েছে। এর বাহ্যিক দিকটুকু রাসূল ﷺ যেভাবে সম্পাদন করেছেন সেভাবেই করতে হয়। আর এর অভ্যন্তরীণ দিকটুকু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি খাঁটি ঈমান, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও বিনম্রতার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

নামায একজন নিষ্ঠাবান নামাযীকে যে কোন অপকর্ম থেকে দূরে রাখে এবং তার সকল পাপ মোচনের একটি বিশেষ কারণ হয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ : فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

অর্থাৎ তোমাদের কি মনে হয়, যদি তোমাদের কারোর ঘরের দরজার পার্শ্বে একটি নদী থাকে আর সে তাতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে তা হলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি ? সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ না। তার শরীরে সত্যিই কোন ময়লা থাকবে না। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তেমনিভাবে কেউ দৈনিক পাঁচ বেলা নামায পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ মুছে দিবেন। (বুখারী, হাদীস ৫২৮ মুসলিম, হাদীস ৬৬৭)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হবে। যে ব্যক্তি নিজের উপর দৈনিক পাঁচ বেলা নামায ফরয হওয়া তথা এর বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করলো সে তো অবশ্যই কাফির। এতে কোন আলিমের কোন ধরনের দ্বিমত

নেই। তবে কেউ অলসতা করে নামায পড়া ছেড়ে দিলে সে এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে না জেনে থাকলে তাকে তা জানানো হবে আর জেনে থাকলে তাকে তিন দিন তাওবার সুযোগ দেয়া হবে। ইতিমধ্যে তাওবা না করলে তাকে মুরতাদ্ হিসেবে (সরকারি আদেশে) হত্যা করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ﴾

অর্থাৎ অতএব তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং নামায আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই। (তাওবাহ্ : ১১)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায না পড়ারই। যে নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো। (মুসলিম, হাদীস ৮২)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

অর্থাৎ যে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করলো তাকে তোমরা হত্যা করো। (বুখারী, হাদীস ৩০১৭)

৩. সক্ষম হলে যাকাত দেয়া:

সম্পদ তখনই কারোর ফায়েদায় আসবে যখন তাতে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে। সেগুলো হলো:

ক. সম্পদগুলো হালাল হওয়া।

খ. সম্পদগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য থেকে বিমুখ না করা।

গ. তা থেকে আল্লাহ্'র অধিকার আদায় করা।

যাকাতের শাব্দিক অর্থঃ প্রবৃদ্ধি, বেশি ও অতিরিক্ত। আর যাকাত বলতে বিশেষ কিছু সম্পদের নির্দিষ্ট একটি বাধ্যতামূলক অংশকে বুঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সংখ্যক বিশেষ লোকদেরকে অবশ্যই দিতে হয়।

যাকাত মূলতঃ মক্কায় ফরয করা হয়েছে। তবে এর নিসাব (যতটুকু সম্পদ হলে যাকাত দিতে হয়), যে যে সম্পদে যাকাত দিতে হয়, যাকাত

ব্যয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি দ্বিতীয় হিজরী সনে নির্ধারিত হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় একটি বিশেষ রুকন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি ওদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা তথা যাকাত গ্রহণ করো। যা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবে। উপরন্তু তাদের জন্য দো'আ করো। নিশ্চয়ই তোমার দো'আ তাদের জন্য শান্তির কারণ হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো সত্যিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (তাওবা : ১০৩)

যাকাতে বাহ্যত সম্পদ কমলেও বস্তুতঃ তাতে বরকত হয় ও পরিমাণে তা অনেক গুণ বেড়ে যায়। উপরন্তু যাকাত আদায়কারীর ঈমান উত্তরোত্তর বেড়ে যায় এবং তার মধ্যে ধীরে ধীরে দানের অভ্যাস গড়ে উঠে। তেমনিভাবে যাকাত আদায়ে গুনাহ্ মাফ হয় এবং তা জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম। উপরন্তু যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায়কারীর অন্তর কার্পণ্য ও দুনিয়ার অদম্য লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হয়। গরীবদের সাথে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সম্পদ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে যে বস্তুতে যাকাত আসে: স্বর্ণ-রূপা, টাকা-পয়সা, গরু,ছাগল, উট, জমিনে উৎপন্ন ফসলাদি ও শস্য যা মাপা ও ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করা যায় এবং ব্যবসায়ী পণ্য।

স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম ও রূপা ৫৯৫ গ্রাম হলে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হলে শতকরা ২,৫% হারে তার যাকাত দিতে হয়। তেমনিভাবে টাকা-পয়সা উপরোক্ত স্বর্ণ কিংবা রূপার কোন একটির পরিমাণে পৌঁছুলে শতকরা ২,৫% হারে তারও যাকাত দিতে হয়। তেমনিভাবে গরু, উট কিংবা ছাগল পুরো বছর অথবা বছরের বেশিরভাগ সময় চারণভূমিতে চরে খেলে গরু ত্রিশটি হলে তা থেকে একটি এক বছরের গরু, ছাগল চল্লিশটি হলে তা থেকে একটি ছাগল এবং উট পাঁচটি হলে একটি ছাগল দিতে হয়। অনুরূপভাবে ফসলাদি ও শস্য ৭৫০ কিলো হলে এবং তা বিনা সেচে উৎপন্ন হলে তা থেকে দশ ভাগের এক ভাগ আর সেচ দিতে হলে তা থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ

দিতে হয়। আর যে কোন ব্যবসায়ী পণ্য স্বর্ণ কিংবা রূপার কোন একটির পরিমাণে পৌঁছুলে শতকরা ২,৫% হারে তারও যাকাত দিতে হয়।

যারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত: ফকির, মিসকীন, যাকাত উসুল ও সংরক্ষণকারী, যাদের অচিরেই মোসলমান হওয়ার আশা করা যায়, কেনা গোলাম যে টাকার বিনিময়ে নিজকে স্বাধীন করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে, ঋণ আদায়ে অক্ষম এমন ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্'র পথের যোদ্ধা, দা'য়ী ও সম্বলহারা মুসাফির।

৪. রামাযান মাসে সিয়াম পালন:

অন্তরের বিশুদ্ধতা ও প্রশান্তি নিজ প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। আর বেশি খানাপিনা, বেশি কথা, বেশি ঘুম ও অন্য মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা এ পথে বিরাট বাধা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মাঝে বেশি খানাপিনা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এ জাতীয় রোযার ব্যবস্থা করেন। সিয়ামের শাব্দিক অর্থঃ সংযম, উপবাস ইত্যাদি। আর রোযা বলতে খানাপিনা, সহবাস ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু সমূহ হতে সুব্হে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত রোযার নিয়্যাতে ও সাওয়াবের আশায় বিরত থাকাকে বুঝায়। রোযা আল্লাহ্ভীতি শিক্ষা দেয় এবং তা রোযাদারের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজ কুপ্রবৃত্তি দমন, গুরুত্বপূর্ণ যে কোন দায়িত্ব পালন, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া ও কষ্টের কাজে ধৈর্য ধারণের মতো ভালো ভালো অভ্যাস গড়ে তোলায় বিশেষ সহযোগিতা করে।

রোযা দ্বিতীয় হিজরী সনে ফরয করা হয়। রামাযানের মাস হচ্ছে মাসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রোযার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ হাতেই দিবেন। কেউ খাঁটি ঈমান নিয়ে একমাত্র সাওয়াবের আশায় পুরো মাস রোযা থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং সে জান্নাতে "রাইয়ান" নামক গেইট দিয়ে ঢুকার সুযোগ পাবে যা একমাত্র রোযাদারদের জন্যই নির্ধারিত। উপরন্তু রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর একটি বিশেষকরে সাতাশ তারিখের রাতটি শবে ক্বদররূপে সংঘটিত হতে পারে। যা হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ মাসের চাইতেও উত্তম। উক্ত রাতে কেউ খাঁটি ঈমান নিয়ে একমাত্র সাওয়াবের আশায় নফল নামায ও দো'আয় ব্যস্ত থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। তবে সে রাতে নিম্নোক্ত

দো'আটি বেশি বেশি বলার চেষ্টা করবে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু। অন্যকে ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিযী, হাদীস ৩৫১৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৫০)

রামাযানের রোযা মুসলিম, সাবালক, জ্ঞান সম্পন্ন, রোযা রাখতে সক্ষম, নিজ এলাকায় অবস্থানরত এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার উপরই ফরয। তবে মহিলাদেরকে এরই পাশাপাশি ঋতুস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব থেকেও মুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তা ফরয করা হয়েছে পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা আল্লাহ্ভীরু হতে পারো। (বাক্বারাহ্ : ১৮৩)

কেউ দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত, রোযার কথা মনে রেখে, জেনেশুনে যে কোন খাদ্যপানীয় গ্রহণ করলে, সহবাস করলে, যে কোনভাবে বীর্যপাত করলে অথবা খাদ্যের কাজ করে এমন কোন ইঞ্জেকশান গ্রহণ করলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। তেমনিভাবে মহিলাদের ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব হলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। অনুরূপভাবে মুরতাদ্ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী) হলেও। উক্ত যে কোন কারণে রোযা ভেঙ্গে গেলে তার পরিবর্তে আরেকটি রোযা কাযা দিতে হবে। তবে রোযার দিনে সহবাস করলে কাযা, কাফ্ফারাহ্ উভয়টিই দিতে হবে উপরন্তু সে মহাপাপীরূপেও বিবেচিত হবে। আর কাফ্ফারাহ্ হচ্ছে একটি কেনা গোলাম স্বাধীন করা। তা সম্ভবপর না হলে দু' মাস লাগাতার রোযা রাখা। আর তাও সম্ভবপর না হলে ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। তাও সম্ভবপর না হলে আর কিছুই দিতে হবে না।

৫. সক্ষম হলে হজ্জ করা:

হজ্জ হচ্ছে মুসলিম ঐক্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক বিশেষ নিদর্শন। হজ্জ ধৈর্য শেখারও এক বিশেষ ক্ষেত্র। তেমনিভাবে হজ্জ বেশি বেশি

সাওয়াব কামানো এবং নিজের সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে মাফ করানো এমনকি তা জান্নাত পাওয়ারও একটি বিশেষ মাধ্যম। উপরন্তু হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বের সকল ধনী মোসলমানগণ একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়ে তাদের সার্বিক অবস্থা জানতে পারেন।

হজ্জ ইসলামের একটি বিশেষ রুকন। যা নবম হিজরী সনে ফরয করা হয়। অতএব তা মুসলিম, সাবালক, স্বাধীন, জ্ঞান সম্পন্ন, হজ্জ করতে সক্ষম এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার উপরই ফরয। যা দ্রুত জীবনে একবারই করতে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা সে সকল লোকের উপর অবশ্যই কর্তব্য যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে সেখানে পৌঁছুতে সক্ষম। কেউ তা করতে অস্বীকার করলে তার এ কথা অবশ্যই জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি অমুখাপেক্ষী। (আলি-'ইমরান : ৯৭)

মহিলাদের হজ্জের সক্ষমতার মধ্যে তাদের সাথে নিজ স্বামী কিংবা অন্য যে কোন মাহ্রাম (যে পুরুষের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উক্ত মহিলার জন্য হারাম) থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

কোন মহিলা হজ্জ কিংবা 'উমরাহ্ কালীন সময়ে ঋতুবতী অথবা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবে উপনীত হলে গোসল করে হজ্জ কিংবা 'উমরাহ্'র ইহ্রাম করবে এবং এমতাবস্থায় সে তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করবে অতঃপর পবিত্র হলে গোসল করে হজ্জের বাকি কাজগুলো সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাবে। আর 'উমরার সময় ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে এবং পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে 'উমরাহ্'র কাজগুলো সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাবে।

হজ্জ বা 'উমরাহ্ করে নফল 'উমরাহ্'র নিয়্যাতে মক্কা থেকে বের হবে না। বরং সে ইচ্ছে করলে 'হারাম এলাকায় থেকে বার বার নফল তাওয়াফ করবে। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ জন্যই তান'ঈমে গিয়ে 'উমরাহ্ করার অনুমতি দিলেন কারণ, তিনি ঋতুবতী হওয়ার দরুন হজ্জের 'উমরাহ্ করতে পারেননি।

বাচ্চা যদি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তা হলে সে সাবালক হওয়ার পূর্বেই নফল হজ্জের ইহরাম করে তা সম্পন্ন করতে পারে। তেমনিভাবে কোন অভিভাবক তার ছোট বাচ্চার পক্ষ থেকেও নিজ ইহ্রামের পাশাপাশি তার জন্যও ইহ্রামের নিয়্যাত করে তাকে সাথে নিয়ে হজ্জ বা 'উমরাহ্'র কাজগুলো যা সে বাচ্চা আংশিক বা পুরোপুরি করতে পারছে না তা সম্পন্ন করবে এবং সে অভিভাবকই তার সাওয়াব পাবে। তবে নাবালক ছেলের কোন হজ্জ ও 'উমরাহ্ ফরয হিসেবে ধর্তব্য হবে না। সাবালক হওয়ার পর তাকে তা আবারো ফরয হিসেবে করতে হবে।

হারাম এলাকায় যেমন নামাযের সাওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনিভাবে তাতে গুনাহ্'র ভয়ানকতাও বেড়ে যায়। তাতে কোন মুশ্রিক বা কাফির ঢুকতে পারে না। তাতে যুদ্ধ শুরু করা ও "ইয্খির" ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদ ও গাছপালা কাটা হারাম। কারোর কোন হারানো জিনিস প্রচারের নিয়্যাত ছাড়া রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেয়া হারাম। উপরন্তু তাতে কোন প্রাণীকে শিকারের জন্য ধাওয়া করা ও তাকে হত্যা করা হারাম।

হজ্জ ও 'উমরাহ্, নামায ও ইসলামের অন্যান্য রুকনগুলো বিস্তারিত বিশুদ্ধ বইপত্র কিংবা বিজ্ঞ আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ স্বল্প পরিসরে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

সমাপ্ত

أركان الإيمان الستة بأدلتها :
প্রমাণসহ ঈমানের ছয়টি রুকন:

শরীয়তের ভাষায় ঈমান বলতে ছয়টি জিনিসের উপর ঈমান আনাকে বুঝায়। যেগুলো হলো: আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তাগণ, রাসূলগণ, রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত কিতাব সমূহ, পরকাল, তাক্বদীরের ভালোমন্দ। জিব্রীল عليه السلام একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল ও ভাগ্যের ভালোমন্দের উপর ঈমান আনা। (বুখারী, হাদীস ৫০ মুসলিম, হাদীস ৮)

ঈমান বলতে তা মূলতঃ কথা ও কাজের সমন্বয়কেই বুঝায়। মুখ ও অন্তরের কথা এবং মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ। ঈমান হচ্ছে একজন মোসলমানের সর্বোত্তম আমল। ঈমান আবার ইবাদতে বাড়ে ও গুনাহে কমে। এর সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এ কথা স্বীকার করা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। উপরন্তু লজ্জা হলো এগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ঈমানের এক ধরনের স্বাদ রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলাকে রব, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রাসূল হিসেবে একান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত। আবার ঈমানের এক ধরনের মিষ্টতাও রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা, কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ভালোবাসা এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় ঘৃণা করার মধ্যেই নিহিত। আর খাঁটি ঈমানদার তখনই হওয়া যায় যখন কেউ ইসলাম প্রদর্শিত ইবাদাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে, ইসলামের আদর্শ নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা অন্যান্যদেরকে আহ্বান করে, প্রয়োজনে নিজের ঈমান ও ইসলাম টেকানোর জন্য নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় হিজরত করে, অন্য কেউ হিজরত করলে তাকে যথাসাধ্য সার্বিক সহযোগিতা করে, সর্বদা ইসলামের জন্য নিজের জান ও মাল কোরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং এ কথা বিশ্বাস করে যে, যা

কিছু আমার নিজের ব্যাপারে কিংবা অন্যের ব্যাপারে ঘটেছে তা না ঘটে পারতো না আর যা কিছু ঘটেনি তা কখনোই ঘটা সম্ভব ছিলো না। আর কারোর ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন সে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে বা ঘৃণা করে এবং কাউকে কোন কিছু দেয় বা দিতে চায় না একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য।

আবার ঈমানের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো সেগুলোর অন্যতম:

আল্লাহ্'র রাসূলকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা, আন্সারী সাহাবাগণকে ভালোবাসা, সকল মু'মিনকে ভালোবাসা, নিজের প্রতিবেশী ও যে কোন মোসলমানের জন্য তাই ভালোবাসা যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে, প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করা, বলার জন্য কোন ভালো কথা না পেলে একদম চুপ করে থাকা, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর কিতাব ও রাসূল এবং মুসলিম প্রশাসক ও সাধারণ মোসলমানদের সর্বদা কল্যাণ কামনা করা।

নিম্নে ঈমানের উপরোক্ত ছয়টি রুকনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলো:

১. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান। তাতে আবার চারটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

ক. আল্লাহ্ তা'আলার মহান অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। তা কিন্তু প্রতিটি মানুষের প্রকৃতির ভেতরেই নিহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ তুমি একনিষ্ঠভাবে ধর্মমুখী হয়ে যাও। আল্লাহ্'র সে প্রকৃতির অনুসরণ করো যে প্রকৃতির উপর তিনি পুরো মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্'র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (রূম : ৩০)

খ. তাঁর রুবূবিয়্যাতের প্রতি ঈমান। তথা তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক ও হুকুমদাতা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থাৎ জেনে রাখো, সকল কিছুর স্রষ্টা তিনি। তাই বিধানও হবে তাঁর। সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ সত্যিই বরকতময়। (আ'রাফ : ৫৪)

গ. আল্লাহ্ তা'আলার উলূহিয়্যাতের উপর ঈমান। তথা তিনিই সত্য মাবূদ। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য। যা তাঁর প্রতি পূর্ণ সম্মান, ভালোবাসা ও ভক্তি দেখিয়ে একমাত্র তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ীই করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু। (বাক্বারাহ্ : ১৬৩)

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলার সকল নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান। তথা তা জানা, বুঝা, মুখস্থ ও স্বীকার করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা ও সেগুলোর চাহিদানুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো নাম রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁকে উক্ত নামগুলোর মাধ্যমেই ডাকবে। যারা তাঁর নামগুলোর ব্যাপারে সত্য পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ করো। তাদেরকে অতি সত্বর তাদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই দেয়া হবে। (আ'রাফ : ১৮০)

ধর্মের মূলই তো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী, তাঁর সমূহ কর্ম, অপরিসীম ভাণ্ডার, ওয়াদা ও হুমকির উপর পূর্ণ ইয়াক্বীন ও দৃঢ় বিশ্বাস করা। মানুষের সমূহ কর্ম ও ইবাদত উক্ত ভিত্তির উপরই নির্ভরশীল। এ ঈমানটুকু দুর্বল হলে আমলও দুর্বল হয়। আর তা সবল হলে আমলও সবল হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ছোট ও বড়ো, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুরই মালিক ও স্রষ্টা। সব কিছুর সার্বিক কর্মক্ষমতা ও সমূহ বৈশিষ্ট্য তাঁরই সৃষ্টি। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। তিনিই বিশ্বের সব কিছু পরিচালনা করেন। সব কিছুর মূল ভাণ্ডার একমাত্র তাঁরই হাতে। এ কথাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্বাস করলে তাতে একজন ঈমানদারের ঈমান অবশ্যই বেড়ে যাবে। শক্তিশালী

হবে। তেমনিভাবে এ কথাগুলোও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির মালিক, নিয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা তিনি এবং এসবগুলোর ভাণ্ডারও একমাত্র তাঁরই হাতে।

২. ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান:

ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনা বলতে তাঁদের ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো ফিরিশ্‌তা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসমূহ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাঁদের উপর আমরা সেভাবেই ঈমান আনবো। আর যাঁদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসমূহ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারিনি তাঁদের উপর আমরা সামগ্রিকভাবেই ঈমান আনবো। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত বান্দাহ্। তাঁরা আমাদের প্রভু বা ইলাহ্ নন এবং এ জাতীয় কোন বৈশিষ্ট্যও তাঁদের মধ্যে নেই। তাঁরা এক বিশেষ নূর থেকে সৃষ্ট এবং তাঁরা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যস্ত। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের একান্ত আনুগত্য ও তা বাস্তবায়নের পুরো ক্ষমতা দিয়েই তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে যা আদেশ করেন তা কখনো তাঁরা অমান্য করেন না। বরং তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হোণ তাঁরা তাই করেন। (তাহ্‌রীম : ৬)

তাঁদের গণনা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউই জানে না। প্রতি দিন বাইতুল মা'মূরে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা নামায পড়েন যাঁরা তাতে আর কখনো নামায পড়ার সুযোগ পাবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাগণকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

তিনি জিব্রীল عليه السلام কে নবী ও রাসূলগণের নিকট তাঁর ওহী পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। মীকাঈল عليه السلام কে পানি ও উদ্ভিদের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইস্‌রাফীল عليه السلام কে সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। আবার মালিক হলেন জাহান্নামের দায়িত্বে এবং রিযওয়ান হলেন জান্নাতের দায়িত্বে। আর মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা হলেন যে কোন প্রাণীর মৃত্যুর দায়িত্বে। আবার কিছু ফিরিশ্‌তা রয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলার আর্‌শ বহন করার

দায়িত্বে। তেমনিভাবে আরো কিছু রয়েছেন জান্নাত ও জাহান্নামের কর্ম সমূহে নিয়োজিত। আবার কিছু রয়েছেন আদম সন্তানের অস্তিত্ব ও তার কর্ম সমূহ হিফাজতের দায়িত্বে। তাঁদের মধ্যে কিছু তো রয়েছেন আবার মানুষের সঙ্গে সর্বদা নিয়োজিত। আবার কিছু রয়েছেন যাঁরা পর্যায়ক্রমে রাত ও দিনে দুনিয়াতে আসা-যাওয়া করেন। আরো কিছু রয়েছেন যাঁরা বিশ্বের যে কোন জায়গায় যিকিরের মজলিস অনুসন্ধান করেন। আবার কিছু রয়েছেন জরায়ুর সন্তানের দায়িত্বে। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে যে কোন সন্তানের রিযিক, আমল, বয়স ও পরকালে তার ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা হওয়ার ব্যাপারটি তখনই লিখে রাখেন। তেমনিভাবে আরো কিছু ফিরিশ্তা রয়েছেন যাঁরা যে কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত হওয়ার পর তার প্রভু, ধর্ম ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহের উপর ঈমান:

আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা বলতে সেগুলোর ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্দের হিদায়াতের জন্য তাঁর নবী ও রাসূলগণের উপর অনেকগুলো কিতাব পাঠিয়েছেন। যা সত্যিই তাঁর নিজস্ব কথা এবং যা একান্ত নিরেট সত্য। উক্ত কিতাবগুলোর কিছুর বর্ণনা কুর'আন মাজীদে এসেছে। আর বাকিগুলোর নাম ও সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। এর মধ্যে "তাওরাত" মূসা عليه السلام এর উপর, "যাবূর" দাঊদ عليه السلام এর উপর, "ইঞ্জীল" 'ঈসা عليه السلام এর উপর এবং "কুর'আন" আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে। তেমনিভাবে ইব্রাহীম عليه السلام এর উপর অনেকগুলো স'হীফাহ্ও নাযিল করা হয়েছে। উক্ত কিতাবগুলোর সকল সত্য সংবাদ আমরা বিশ্বাস করবো এবং সকল অরহিত বিধান আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবো। তবে এ কথা অবশ্যই জানতে হবে যে, স্বভাবতই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ কুর'আন মাজীদ নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে যে তাওরাত ও ইঞ্জীল মানুষের হাতে রয়েছে তা অনেকাংশেই বিকৃত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾

অর্থাৎ আমি তোমার উপর সত্য কিতাব নাযিল করেছি। যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতাও প্রমাণ করে। তেমনিভাবে কুর'আন উক্ত কিতাবগুলোর সংরক্ষক, সাক্ষী ও বিচারক। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহ্'র নাযিলকৃত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করো এবং যে সত্য তুমি পেয়েছো তা ছেড়ে ওদের প্রবৃত্তির কোনভাবেই অনুসরণ করো না। (মায়িদাহ্ : ৪৮)

কুর'আন মাজীদ সর্বশেষ কিতাব যা মহান ও পরিপূর্ণ। তাতে সব কিছুর মৌলিক বিধানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। যা পুরো বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও রহ্‌মত। এর উপর আমরা ঈমান আনবো এবং এর বিধানগুলো আমাদের সার্বিক জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করবো এবং এর আদবগুলো আমরা গ্রহণ করবো। আল্লাহ্ তা'আলা এ ছাড়া অন্য কোন কিতাবের উপর আমল করা গ্রহণ করবেন না। তিনি উক্ত কিতাবকে হিফাজত করার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান:

রাসূলগণের উপর ঈমান বলতে তাদের ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের দিকে ডাকতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করতে তিনি নিষেধ করতেন। তাঁরা সবাই ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের নিকট যে ওহী পাঠিয়েছেন তা তাঁরা সকলেই নিজ নিজ উম্মতের নিকট পুরোপুরিভাবে পৌঁছিয়েছেন। তাঁদের কারো কারোর নাম কুর'আন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। যাঁদের সংখ্যা ২৫ জন। তাঁদের পাঁচ জন হলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। যাঁরা হলেনঃ নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা, 'ঈসা ও মুহাম্মাদ ('আলাইহিমুস্-সালাম)। আর বাকিদের নাম আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করো এবং সকল তাগুত (যার অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়) কে প্রত্যাখ্যান করো। (নাহ্‌ল : ৩৬)

সর্ব প্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ্ عليه السلام। তেমনিভাবে সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সকল নবী ও রাসূলগণ মানুষই ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্দের মধ্য থেকে তাঁদেরকে নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য চয়ন করেছেন এবং তাঁদেরকে মু'জিযাহ্ দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তাঁদের মধ্যে রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। না তাঁরা কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারেন। না তাঁরা কোন কিছুর ভাণ্ডারের মালিক। না তাঁরা কোন গায়িব জানেন বা জানতেন। শুধু তাঁরা তাই জানতেন যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে জানিয়েছেন।

নবী ও রাসূলগণের অন্তর ছিলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, তাঁদের মেধা ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঈমান ছিলো অত্যন্ত খাঁটি, চরিত্র ছিলো অত্যন্ত সুন্দর, ধার্মিকতায় ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত পরিপূর্ণ, ইবাদতে ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, শারীরিক শক্তিতে ছিলেন অধিক শক্তিমান, গঠনাকৃতিতে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর। তাঁরা নিজ উম্মতদেরকে যে ওহীর বাণী শুনিয়েছেন তাতে তাঁরা ছিলেন সকল ভুলের উর্ধ্বে। তাঁদের মৃত্যুর পর কেউ তাঁদের সম্পদের ওয়ারিশ হন না। তাঁদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। মৃত্যুর সময় তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোনটি চয়ন করার এখতিয়ার দেয়া হয়। যেখানে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাঁদেরকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পর তাঁদের শরীরকে মাটি খেতে পারে না। তাঁরা কবরের জীবনে জীবিত। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্ত্রীগণকে বিবাহ্ করা যায় না।

৫. পরকালের প্রতি ঈমান:

পরকালে বিশ্বাস বলতে কিয়ামতের ছোট-বড়ো আলামত, কবরের ফিতনা, আযাব ও শান্তি, কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থান, কিয়ামতের মাঠে সবার সম্মিলিত অবস্থান, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, নেক ও বদের পাল্লা, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায়। ঈমানের আরো অন্যান্য স্তম্ভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর সর্বদা সত্যের উপর অটলতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্। যিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। (নিসা' : ৮৭)

কবরের আযাব আবার দু' ধরনের।

ক. যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো বন্ধ হবে না। যা কাফির ও মুনাফিকদেরকে দেয়া হবে।

খ. যা কোন এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত গুনাহ্গারদেরকে দেয়া হবে। এদের প্রত্যেককে তার গুনাহ্ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। এরপর শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে অথবা গুনাহ্ মাফের কোন কারণ তথা সাদাকায়ে জারিয়া, লাভজনক জ্ঞান অথবা নেককার সন্তানের দো'আ ইত্যাদির কোনটি পাওয়া গেলে তার শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হবে। আর কবরের শান্তি শুধু খাঁটি ঈমানদারদের জন্য। তবে একজন মু'মিন আল্লাহ্'র রাস্তায় শহীদ হওয়া, ইসলামী রাষ্ট্রে পাহারা দেয়া ও পেটের রোগে মারা যাওয়ার দরুন কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের রূহের অবস্থান:

বারযাখী তথা কবরের জীবনে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের রূহ্সমূহের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হবে। কারো কারোর রূহ্ তো থাকবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় তথা আ'লা 'ইল্লিয়্যীনে। সেগুলো হচ্ছে নবীগণের রূহ্। তাদের মর্যাদাগত অবস্থানও আবার ভিন্ন ভিন্ন হবে।

কারো কারোর রূহ্ আবার পাখির ছবিতে জান্নাতের গাছে গাছে ঝুলানো থাকবে। সেগুলো হচ্ছে মু'মিনদের রূহ্। আবার কারো কারোর রূহ্ তো সবুজ বর্ণের পাখির পেটে থাকবে যেগুলো জান্নাতের সর্ব জায়গায় ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াবে। সেগুলো হচ্ছে শহীদ্দের রূহ্। কারো কারোর রূহ্ আবার কবরে বন্দী থাকবে। সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎকারীদের রূহ্। আবার কারো কারোর রূহ্ জান্নাতের দরজায় আটকানো থাকবে। সেগুলো হচ্ছে ঋণগ্রস্তদের রূহ্। কারো কারোর রূহ্ আবার জমিনে আটকানো থাকবে। সেগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট রূহ্। কাফির, মুনাফিক ও মুশ্রিকদের রূহ্। আবার কারো কারোর রূহ্ থাকবে আগুনের চুলোয়। সেগুলো হচ্ছে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর রূহ্। কারো কারোর রূহ্ আবার রক্তের নদীতে সাঁতরাবে এবং তাদের মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হবে। সেগুলো হচ্ছে সুদ গ্রহিতার রূহ্।

৬. ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি ঈমানঃ

ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি ঈমান বলতে সে ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, দুনিয়াতে ভালোমন্দ যাই ঘটুক না কেন সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বহু পূর্ব থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন তাই তা ঘটেছে। ভাগ্যের ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর এক বিরাট রহস্য। যা তাঁর কোন নিকটতম ফিরিশ্তা বা রাসূলগণও জানেন না। তাতে আবার চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা হলোঃ

ক. এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সামগ্রিকভাবেই জানেন। আল্লাহ্'র সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ ও সাত জমিন। সেগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যেন তোমরা বুঝতে পারো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান রাখেন। (তালাক : ১২)

খ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টি, তাদের অবস্থা ও রিযিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লাওহে মাহ্ফূযে লিখে রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

অর্থাৎ তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই জানেন এবং সব কিছুই লিখিত রয়েছে কিতাবে তথা লাওহে মাহ্ফূযে। অবশ্যই এ কাজটি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খুবই সহজ। (হজ্জ : ৭০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির ভাগ্য আকাশ ও জমিন সৃষ্টির

পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিখে রেখেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬৫৩)

গ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে এর কোন কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া ঘটেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই করেন। (ইব্রাহীম : ২৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾

অর্থাৎ তোমার প্রভু চাইলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না। (আন'আম : ১১২)

ঘ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তিনিই প্রতিপালক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব কিছুর রক্ষকও। (যুমার : ৬২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এমনকি তোমাদের সমূহ কর্মকেও সৃষ্টি করেছেন। (স্বাফ্ফাত : ৯৬)

সমাপ্ত

نواقض الإسلام العشرة :
ইসলাম বিধ্বংসী দশটি বিষয়ঃ

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা! দশটি এমন মারাত্মক কাজ ও বিশ্বাস রয়েছে যার কোন একটি কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে (ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভয়ে, ঠাট্টাবশত যেভাবেই হোক না কেন) সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে এবং নির্ঘাত কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। সে বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরীক করা। মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তাদের নিকট কোন ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা, তাদের জন্য কোন পশু জবাই করা অথবা তাদের জন্য কোন কিছু মানত করা ইত্যাদি শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা তবে তিনি এছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যার জন্য ইচ্ছে করেন। (নিসা : ৪৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করেন তার উপর জান্নাতকে করেন হারাম এবং জাহান্নামকে করেন তার শেষ ঠিকানা। আর তখন এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (মা-ইদাহ্ : ৭২)

২. বান্দাহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে এমন কাউকে স্থির করা যাকে বিপদের সময় ডাকা হয়, তার সুপারিশ কামনা করা হয়, তার উপর কোন ব্যাপারে ভরসা করা হয়। এমন ব্যক্তি সকল আলেমের ঐক্যমতে কাফির।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦

وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ

مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴾

অর্থাৎ আর তুমি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই। তিনি নিজ বান্দাহ্দের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। (ইউনুস : ১০৬-১০৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ﴾

অর্থাৎ আপনি বলুন: তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্'র পরিবর্তে পূজ্য মনে করতে তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। তাঁর নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদের পক্ষেই কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে। (সাবা : ২২-২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

অর্থাৎ জেনে রেখো, শিরক অবিমিশ্র আনুগত্য শুধু আল্লাহ্'রই জন্য। যারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে অন্য কাউকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা এদের পূজা-অর্চনা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্'র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কলহপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা দিবেন। প্রত্যেককে যথোচিত প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। (যুমার : ৩)

৩. কোন কাফির ব্যক্তিকে কাফির মনে না করা অথবা সে ব্যক্তি যে সত্যিই কাফির এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস তথা জীবন ব্যবস্থাকে সঠিক মনে করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা এবং আল্লাহ্'র পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান আনো। (মুম্তাহিনাহ্ : ৪)

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই বলে স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত পূজ্য সকল বস্তুর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার জান ও মাল অন্যের উপর হারাম এবং তার সকল হিসাব-কিতাব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে ন্যস্ত। (মুসলিম, হাদীস ২৩)

৪. রাসূল ﷺ আনিত জীবনাদর্শ ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শকে উত্তম মনে করা অথবা রাসূল ﷺ আনিত বিচারব্যবস্থার চাইতে অন্য বিচারব্যবস্থাকে উন্নত কিংবা সমপর্যায়ের মনে করা। তেমনিভাবে মানবরচিত বিধি-বিধানকে ইসলামী বিধি-বিধান চাইতে উত্তম মনে করা অথবা এমন মনে করা যে, ইসলামী বিধি-বিধান এ আধুনিক যুগে বাস্ত বায়নের উপযুক্ত নয় অথবা ইসলামী সনাতন বিধি-বিধানকে আঁকড়ে ধরার কারণেই আজ মুসলমানদের এই অধঃপতন অথবা ইসলাম হচ্ছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জন্য; রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, দন্ডবিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানবরচিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য যেমনিভাবে ইসলামী বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে আলেমদের কোন মতভেদ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা সম্পূর্ণরূপে কাফির। (মায়িদাহ্ : ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

অর্থাৎ তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধান কামনা করে? মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্'র বিধান চাইতে অন্য কোন বিধান উত্তম হতে পারে কি? (মায়িদাহ্ : ৫০)

তিনি আরো বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾

অর্থাৎ অতএব আপনার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেয়, এমনকি আপনি যে ফায়সালা করবেন তা দ্বিধাহীন হৃদয়ে গ্রহণ না করে এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে না নেয়। (নিসা : ৬৫)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত শরয়ী বিধানের কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যদিও সে তদানুযায়ী আমল করুক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴾

অর্থাৎ তা (দুর্ভোগ ও কর্মব্যর্থতা) এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্'র অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন। (মুহাম্মাদ্ : ৯)

৬. ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করা অথবা উহার কোন পুণ্য কিংবা
শাস্তিবিধিকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾

অর্থাৎ হে রাসুল! আপনি বলে দিন: তবে কি তোমরা আল্লাহ্; তাঁর আয়াতসমুহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের কোন কৈফিয়ত গ্রহণ করা হবে না। তোমরা মুমিন বলে নিজকে প্রকাশ করে

থাকলেও এখন কাফের হয়ে গিয়েছে। (তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)

৭. যাদু শেখা কিংবা শেখানো অথবা তাতে বিশ্বাস করা। তেমনিভাবে যে কোন পন্থায় কারোর মাঝে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

অর্থাৎ সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) কুফুরি করেননি, তবে শয়তানরাই কুফুরি করেছে, তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো বাবেল শহরে বিশেষ করে হারূত-মারূত ব্যক্তিদ্বয়কে। (জিব্রীল ও মীকাঈল) ফিরিশ্তাদ্বয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি (যা ইহুদিরা ধারণা করতো)। তবে ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতোঃ আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র, অতএব তোমরা কুফরী করো না। (বাকারাহ্ : ১০২)

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে।

জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

حَدُّ السَّاْحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

অর্থাৎ যাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের কোপ তথা শিরশ্ছেদ। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৬০)

জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করেও দেখিয়েছেন।

আবু 'উস্মান নাহ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ عِنْدَ الْوَلِيْدِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً وَأَبَانَ رَأْسَهُ، فَعَجِبْنَا فَأَعَادَ رَأْسَهُ، فَجَاءَ جُنْدُبُ الْأَزْدِيْ فَقَتَلَهُ

অর্থাৎ ইরাকে ওয়ালীদ্ বিন্ 'উক্ববার সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিলো। সে জনৈক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে ভিন্ন করে ফেলে। এতে আমরা খুব বিস্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে তাকে হত্যা করে। (বুখারী/আত্তা'রীখুল্ কাবীর: ২/২২২ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬)

তেমনিভাবে উম্মুল্ মু'মিনীন 'হাফ্সা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ও নিজ

ক্রীতদাসীকে জাদুকর প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করে।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

سَحَرَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - جَارِيَةٌ لَهَا، فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ﷺ فَغَضِبَ، فَأَتَاهُ اِبْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ: جَارِيَتُهَا سَحَرَتْهَا، أَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، قَالَ: فَكَفَّ عُثْمَانُ ﷺ قَالَ الرَّاوِيْ: وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لِقَتْلِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ

অর্থাৎ 'হাফ্সা বিন্ত 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে তাঁর এক ক্রীতদাসী যাদু করে। এমনকি সে এ ব্যাপারটি স্বীকার করে এবং যাদুর বস্তুটি উঠিয়ে ফেলে দেয়। এতদ্ কারণে 'হাফ্সা ক্রীতদাসীকে হত্যা করে। সংবাদটি 'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট পৌঁছুলে তিনি রাগান্বিত হন। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ ব্যাপারে চুপ হয়ে যান তথা তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন: 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অনুমতি না নিয়ে ক্রীতদাসীকে হত্যা করার কারণেই তিনি রাগান্বিত হন। ('আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১৮৭৪৭ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬)

অনুরূপভাবে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাঁর খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন।

বাজালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ الرَّاوِيْ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ

অর্থাৎ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আমরা চারজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি। (আবু দাউদ, হাদীস ৩০৪৩ বায়হাকী : ৮/১৩৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৯৯৭২ আহ্মাদ্, হাদীস ১৬৫৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৮৬০, ৮৬১)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখায়নি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণ করে।

৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের সহযোগিতা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না। (মা-ইদাহ্ : ৫১)

৯. অধিক আমলের দরুন কিংবা অন্য যে কোন কারণে কোন ব্যক্তি শরয়ী বিধি-বিধান মানা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে এমন ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ যে কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই গ্রহনযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল- ইমরান : ৮৫)

১০. ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া (দ্বীনি কোন কথা শুনেও না তেমনিভাবে আমলও করে না) অর্থাৎ দ্বীনের কোন ধার ধারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তাঁর প্রভুর নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো ; অথচ সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো তার অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবো। (সাজদাহ্ : ২২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কোরআন থেকে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উত্থিত করবো অন্ধাবস্থায় কিয়ামত দিবসে। (ত্বাহা : ১২৪)

সমাপ্ত

معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأركانها وشروطها :
”লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহঃ

এটি হচ্ছে তাওহীদ, ইখ্লাস ও তাক্বওয়ার কালিমা এবং এটিই হচ্ছে একজন মোসলমানের জন্য শক্ত কড়া। এর জন্যই আকাশ ও জমিন স্থির রয়েছে। এর পরিপূর্ণতার জন্যই সুন্নাত ও ফরযের বিধান রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝে এর সমূহ বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এর চাহিদা মতো আমল করে সেই তো খাঁটি মোসলমান। অন্যথা নয়।

”লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ভাবার্থঃ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ বা উপাস্য নেই। তথা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। ইবাদতে তাঁর কোন শরীক নেই যেমনিভাবে সৃষ্টিকুলের মালিকানায় তাঁর কোন শরীক নেই।

”লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র রুকনসমূহঃ

এর রুকন হচ্ছে দু'টি। যা নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা।

খ. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।

”লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র শর্তসমূহঃ

১. কালিমার অর্থ ভালোভাবে জানা ও এ কালিমা কি করতে বলে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং তার উপর আমল করা। কেউ যদি এ কথা জানে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি এ ব্যাপারে একক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত বাতিল বলে গণ্য। উপরন্তু সে উক্ত জ্ঞানানুযায়ী আমলও করে তা হলে সে কালিমার অর্থ বুঝেছে বলে দাবি করতে পারে। অন্য কথায়, কেউ কালিমার অর্থ ভালোভাবে জানলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ যে ইবাদতের সামান্যটুকুরও অংশীদার হতে পারে এমন কথা ও কাজ সে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর একচ্ছত্র আনুগত্য করা, কাউকে এককভাবে ভয় করা এবং কাউকে সকল আশা ও

ভরসার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা ইত্যাদি সত্যিই কালিমা বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসের কারণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অর্থাৎ তুমি জেনে রাখো যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ বা উপাস্য নেই। (মুহাম্মাদ : ১৯)

২. উক্ত কালিমার সাক্ষ্য প্রশান্তিময় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত যে বাতিল বলে গণ্য উপরন্তু অন্য কারোর জন্য যে ইবাদতের সামান্যটুকুও ব্যয় করা জায়িয নয় এ কথাগুলো সত্য বলে মনেপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে। কেউ যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয় বোধ করে তা হলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান এনেছে। অতঃপর তাতে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করেনি। (হুজুরাত : ১৫)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্'র রাসূল এ ব্যাপারে কোন বান্দাহ্ নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, হাদীস ২৭)

৩. উক্ত কালিমা যা ধারণ করে ও করতে বলে তা সম্পূর্ণরূপে

কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়া। তথা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। এর কোন কিছুই পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমনঃ ইহুদি-খ্রিস্টানের আলিমরা উক্ত কালিমার অর্থ জানতো এবং তা বিশ্বাসও করতো। তবে তারা তা অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করেনি ও মেনে নেইনি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল ﷺ কে এমনভাবে চিনে যেমন চিনে নিজ পুত্রসন্তানদেরকে। তবে নিশ্চয়ই তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে। (বাক্বারাহ্ : ১৪৬)

যারা শরীয়তের কোন বিধান কিংবা দণ্ডবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন: চুরি ও ভ্যবিচারের দণ্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের উপর নাক সিটকায় তারা যে উক্ত কালিমার চাওয়া-পাওয়া মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৪. উক্ত কালিমা যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেয়া। তথা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোন ধরনের কমানো বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়া এবং কাজে পরিণত করা। উপরন্তু তা নিয়ে কোন প্রশ্নের অবতারণা না করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ ﴾

অর্থাৎ তোমরা নিজ প্রভু অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো। (যুমার : ৫৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾

অর্থাৎ তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে

নেয় অতঃপর তোমার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়। (নিসা' : ৬৫)

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত কালিমা যা বুঝায় তা মৌখিকভাবে মেনে নেয়া আর এ শর্ত হচ্ছে তা কার্যগতভাবে মেনে নেয়া।

যারা শরীয়তের বিচার বাদ দিয়ে মানব রচিত বিচারের নিকট ধন্না দেয় তারা যে উক্ত কালিমার চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৫. উক্ত কালিমা যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়া। এ কালিমার প্রতি অন্যকে দা'ওয়াত দেয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং (কথায় ও কাজে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। (তাওবাহ্ : ১১৯)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে বলবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহ্মাদ্ : ৪/১১)

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে এর পুরোটা কিংবা কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে উক্ত কালিমা বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং সে মুনাফিক বলেই বিবেচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থাৎ মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা বলেঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান এনেছি অথচ তারা সত্যিকারার্থে কোন ঈমানই আনেনি। (বাক্বারাহ্ : ৮)

৬. উক্ত কালিমার প্রতি বিশ্বাস যে কোন শির্কের লেশ থেকে মুক্ত করা।

তথা তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে। তা কাউকে দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোন লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় না হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾

অর্থাৎ জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। (যুমার : ৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পেয়ে ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি যে খাঁটি মনে বলেছে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। (বুখারী, হাদীস ৯৯)

৭. উক্ত কালিমা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং যা এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা। তথা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসা এবং এঁদের ভালোবাসা সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া। উপরন্তু এঁদের ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ করা। তথা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয়, আশা ও সম্মান দিয়ে ভালোবাসা। এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ। এমন সকল সময়কেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: রামাযান, জিল্হজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল ব্যক্তিবর্গকেও ভালোবাসা যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: নবী, রাসূল, ফিরিশতা, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। এমন সকল কাজকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন যেমনঃ যিকির, কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশ্রিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফরি, ফাসিকী ও যে কোন গুনাহ্কে অপছন্দ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ্ হয়ে গেলে তথা নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কিছুই আসে যায় না। বরং অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। এ ব্যাপারে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না। (মায়িদাহ্ : ৫৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

অর্থাৎ তুমি এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে ; অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে। যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। (মুজাদালাহ্ : ২২)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ

অর্থাৎ যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং মোসলমান হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি ভালোবাসা। (বুখারী, হাদীস ১৬ মুসলিম, হাদীস ৪৩)

এর বিপরীতে কোন মু'মিনকে শত্রু এবং কোন কাফির ও মুশ্‌রিককে বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী।

সমাপ্ত

معنى شهادة أن محمدا رسول الله

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহঃ

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এর ভাবার্থঃ

কায়মনোবাক্যে এ কথা বিশ্বাস করা ও সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দাহ্ ও রাসূল। তাঁকে সকল মানব ও জিনের নিকট পাঠানো হয়েছে। অতএব তিনি আগপরের যা সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করতে হবে। হালাল-হারামের যে বিধান তিনি দিয়েছেন তা মাথা পেতে নিতে হবে। যা আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁর আনীত শরীয়ত মানতে হবে এবং তাঁর আদর্শ ধরতে হবে। প্রকাশ্যে ও গোপনে। তাঁর ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাঁর আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই বিরুদ্ধাচরণ। কারণ, তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর একজন বার্তা বাহক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি উম্মতকে এমন পথে রেখে গেছেন যা দিবারাত্র উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। যে এর বাইরে চলবে সেই পথভ্রষ্ট।

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এর রুকনসমূহঃ

এর রুকন হচ্ছে দু'টি:

ক. মুহাম্মাদ ﷺ ই যে আমাদের একমাত্র রাসূল যাঁর আদর্শ ও আনীত শরীয়ত আমরা সবাই মানতে বাধ্য---এ কথা বিশ্বাস করা।

খ. তিনি যে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বান্দাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল এ ছাড়া আর কিছুই নন---তা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা। তিনি কোনভাবেই আল্লাহ্'র শরীক নন। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ। সকল মানবিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তবে তিনি গুনাহ্ থেকে পবিত্র এবং তাঁর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসতো। যারা রাসূল ﷺ কে নূরের তৈরি বলে এবং বলে তাঁর কোন ছায়া নেই তারা সত্যিই প্রকাশ্য মিথ্যাবাদী এবং যারা রাসূল ﷺ কে সর্বদা হাযির-নাযির ভাবে তারা অবশ্যই তাঁকে আল্লাহ্'র বান্দাহ্ হিসেবে স্বীকার করে না। বরং তারা তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ কিংবা তাঁর ঊর্ধ্বে ভাবে। আমরা তাঁকে

অবশ্যই ভালোবাসবো এবং তাঁর ভালোবাসা আমাদের নিজ জীবন, স্ত্রী, সন্তান ও সকল মানুষের ভালোবাসার উপর আমরা সর্বাধিক প্রাধান্য দেবো। তবে এ ভালোবাসা তিনি পাচ্ছেন তিনি আল্লাহ্'র রাসূল বলেই এবং আমরা তা করছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যই।

তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্দুল মুত্তালিব বিন্ হাশিম কুরাশী। তাঁর মা হচ্ছেন আ'মিনাহ্ বিন্ত ওয়াহাব। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হাতীর সালে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মারা যান যখন তিনি মায়ের গর্ভে। তাঁর জন্ম হলে তাঁর লালন-পালনের সর্বপ্রথম দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর দাদা আব্দুল-মুত্তালিব। অতঃপর তাঁর চাচা আবু তালিব। তাঁর মাতা মারা যান যখন তাঁর বয়স ছয় বছর। তিনি মহান চরিত্র ও উত্তম বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন যাপন করছিলেন। তাতে তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে আল-আমীন খিতাবে ভূষিত করে। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর নিকট সর্ব প্রথম ওহী আসে। তখন তিনি ছিলেন হেরা গর্তে। অতঃপর তিনি সবাইকে মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্'র ইবাদতের দিকে ডাকেন এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে বলেন। তখন তারা তাঁকে হরেক রকমের কষ্ট দেয়। এতে তিনি ধৈর্য ধরলে মদীনায় হিজরতের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে বিশ্বের বুকে জয়ী করেন। অতঃপর ইসলামের সকল বিধান নাযিল হয়। তখন ইসলাম পরাক্রমশালীরূপে পূর্ণতা লাভ করে। পরিশেষে তিনি হিজরী **১১** সনে রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ সোমবার তেষট্টি বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলার পানে পাড়ি জমান। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর পূর্ণ দায়িত্ব পালেন। তথা তাঁর উম্মতকে সকল কল্যাণের পথ বাতলে দেন এবং সকল অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেন।

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এর শর্তসমূহঃ

১. রাসূল ﷺ এর প্রতি উক্ত সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানা। যারা রাসূল ﷺ এর প্রতি অধিক ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ কিংবা তাঁর ঊর্ধ্বে পৌঁছে দিয়েছে তারা অবশ্যই উক্ত সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানেনি।

২. উক্ত সাক্ষ্য প্রশান্তিময় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। কেউ যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং রাসূল ﷺ ছাড়া অন্য কারোর

আদর্শ যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয় বোধ করে তাহলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান এনেছে। অতঃপর তাতে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করেনি। (হুজুরাত : ১৫)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্'র রাসূল এ ব্যাপারে কোন বান্দাহ্ নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, হাদীস ২৭)

৩. উক্ত সাক্ষ্য যা ধারণ করে ও করতে বলে তা সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়া। তথা রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। এর কোন কিছুই পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমন: ইহুদি-খ্রিস্টানের আলিমরা তাঁকে ভালোভাবে চিনতো, তাঁর ব্যাপারে উক্ত সাক্ষ্যের অর্থ সঠিকভাবে জানতো এবং তা বিশ্বাসও করতো। তবে তারা তা অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করেনি ও মেনে নেয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল ﷺ কে এমনভাবে চিনে যেমন চিনে নিজ পুত্রসন্তানদেরকে। তবে নিশ্চয়ই তাদের এক দল

জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে। (বাক্বারাহ্ : ১৪৬)

যারা শরীয়তের কোন বিধান কিংবা দণ্ডবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন: চুরি ও ব্যভিচারের দণ্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের উপর নাক সিটকায় তারা যে উক্ত সাক্ষ্যর চাওয়া-পাওয়া মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৪. উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেয়া। তথা রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোন ধরনের কমানো বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়া এবং কাজে পরিণত করা। উপরন্তু তা নিয়ে কোন প্রশ্নের অবতারণা না করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

অর্থাৎ তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয় অতঃপর তোমার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়। (নিসা' : ৬৫)

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত বলতে রাসূল ﷺ এর প্রতি উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা মৌখিকভাবে মেনে নেয়া আর এ শর্ত হচ্ছে তা কার্যগতভাবে মেনে নেয়া।

যারা শরীয়তের বিচার বাদ দিয়ে মানব রচিত বিচারের নিকট ধন্না দেয় তারা যে উক্ত সাক্ষ্যর চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৫. উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়া। এ সাক্ষ্যর প্রতি অন্যকে দা'ওয়াত দেয়া এবং রাসূল ﷺ এর আনুগত্য ও তাঁর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো

এবং (কথায় ও কাজে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। (তাওবাহ্ : ১১৯)

রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে এর পুরোটা কিংবা কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে উক্ত সাক্ষ্যর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং সে মুনাফিক বলেই বিবেচিত।

৬. উক্ত সাক্ষ্যর প্রতি বিশ্বাস যে কোন শির্কের লেশ থেকে মুক্ত করা। তথা তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে। তা কাউকে দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোন লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় না হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾

অর্থাৎ জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। (যুমার : ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো। আর যে তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোন মানে হয় না) বরং (হে রাসূল! তুমি জেনে রাখো,) আমি তোমাকে তাদের রক্ষকরূপে পাঠাইনি। (নিসা' : ৮০)

৭. উক্ত সাক্ষ্যর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং যা এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা। তথা রাসূল ﷺ কে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসাকে সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া। উপরন্তু তাঁর ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ করা। তথা তাঁকে মনেপ্রাণে অগাধ সম্মান দিয়ে ভালোবাসা। এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন: মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ। এমন সকল সময়কেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমনঃ রামাযান, জিল্হজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল সত্তা ও ব্যক্তিকেও ভালোবাসা যাঁদেরকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ছাড়া অন্যান্য নবী, রাসূল, ফিরিশতা, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। এমন

সকল কাজকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমনঃ নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমনঃ যিকির, কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশ্‌রিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফরি, ফাসিকী ও যে কোন গুনাহ্‌কে অপছন্দ করা। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ্‌ হয়ে গেলে তথা নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছুই আসে যায় না। বরং অচিরেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। এ ব্যাপারে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না। (মায়িদাহ্‌ : ৫৪)

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡ ﴾

অর্থাৎ তুমি এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে ; অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে। যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। (মুজাদালাহ্‌ : ২২)

আনাস্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ

অর্থাৎ যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে। একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ্‌

তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং মোসলমান হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি ভালোবাসা। (বুখারী, হাদীস ১৬ মুসলিম, হাদীস ৪৩)

এর বিপরীতে কোন মু'মিনকে শত্রু এবং কোন কাফির ও মুশ্‌রিককে বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী।

যে কোন গুনাহ্'র কাজ করা ও যে কোন বিদ্'আতে লিপ্ত হওয়া উক্ত সাক্ষ্য বিরোধী। কারণ, যে কোন গুনাহ্গার গুনাহ্'র মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে কোন বিদ্'আতী বিদ্'আতের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর আদর্শ ও তাঁর সঠিক ইত্তিবা' থেকে বের হয়ে যায়।

আমলী বিদ্'আতীরা যদি সত্য জানার অগাধ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সত্য পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারে তা হলে হয়তো বা তারা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা পেয়ে যেতে পারে তবে তাদের বিদ্'আতী কর্মকাণ্ড কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। আর বিদ্'আতীদের মধ্যে যারা ইমাম পর্যায়ের বা নেতৃস্থানীয় তারা যদি সত্য বুঝেও তা গ্রহণ না করে তাদের পূর্বেকার বিদ্'আতী কর্মকাণ্ডের উপর অটল থাকে তাহলে তাদের সাথে আবু জাহ্ল, 'উত্বাহ্ ও ওলীদের মতো বড়ো বড়ো কাফিরদের কিছুটা হলেও মিল রয়েছে বললে তা তাদের ব্যাপারে বেশি বলা হবে না। যারা একদা নিজেদের পদ-মর্যাদা টেকানোর জন্য রাসূল ﷺ এর ওহীর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনিভাবে ইমামগণের অনুসারীদের মধ্যেও যারা সত্য বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করে তারাও ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾

অর্থাৎ বরং তারা বলেঃ আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও এই একই মতাদর্শের উপর পেয়েছি। অতএব আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবো। (যুখরুফ : ২২)

সমাপ্ত

صفة الوضوء

ওযুর বিশুদ্ধ পদ্ধতি:

১. সর্বপ্রথম ওযুর শুরুতে পবিত্রতার নিয়্যাত করবে। তবে মনে রাখবে, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। বরং তা মনে সংকল্প করার বিষয়।

২. ”বিস্‌মিল্লাহ্” পড়ে ওযু শুরু করবে।

৩. ডান দিক থেকে ওযু শুরু করবে।

৪. দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিবে।

৫. হাত ও পদযুগল ধোয়ার সময় আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে মলে নিবে।

৬. এক বা তিন চিল্লু (করতলভর্তি পরিমাণ) পানি ডান হাতে নিয়ে তিন তিন বার একই সাথে কুল্লি করবে ও নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দিয়ে নাকের ছিদ্রদ্বয় ভালভাবে ঝেড়ে নিবে।

৭. তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল (কান থেকে কান এবং মাথার সম্মুখবর্তী চুলের গোড়া থেকে চিবুক ও দাড়ির নীচ পর্যন্ত) ধুয়ে নিবে।

৮. দাড়ি খেলাল করবে।

৯. উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধুয়ে নিবে।

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ্ করবে। তথা ভেজানো হাত দু'টো মাথার সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে এবং পেছনের দিক থেকে মাথার সামনের দিকে টেনে আনবে। উপরন্তু কান দু'টোও মাসেহ্ করবে। তথা উভয় তর্জনীর মাথা দু'টো উভয় কানে ঢুকাবে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বহিরাংশ মাসেহ্ করবে।

১১. উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়ে নিবে।

১২. ওযু শেষে নিম্ন বসনে পানি ছিঁটিয়ে দিবে।

১৩. ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করবে।

শাহাদাতাইন পাঠ করবে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

উক্‌বা বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ভালভাবে ওযু করে যখন পড়বে: "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুল্লাহি ওয়ারাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দাহ্ ও রাসূল) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন। (মুসলিম, হাদীস ২৩৪ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৭৫)

অথবা বলবে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযু করে পড়বে: "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ্'আল্নী মিনাত্ তাওআবীনা ওয়াজ্আল্নী মিনাল্ মুতাতাহ্হিরীন (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ; তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন। (তিরমিযী, হাদীস ৫৫)

নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যেতে পারে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ "সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি পূতপবিত্র এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস ৮১)

১৪. পরিশেষে দু' রাক্'আত নামায পড়বে। যে ব্যক্তি ওযু শেষে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাত হবে তার জন্য অবধারিত।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ওযুর ন্যায় ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। (বুখারী, হাদীস ১৬৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

'উক্বা বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অর্থাৎ যে কোন মুসলমান যখন ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (মুসলিম, হাদীস ২৩৪)

ওযুর ফরয ও রুকনসমূহ:

ধর্মীয় কোন কাজ বা আমলের ফরয বা রুকন বলতে এমন কিছু ক্রিয়াকর্মকে বুঝানো হয় যা না করা হলে ঐ কাজ বা আমলটি সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না যতক্ষণ না সে ঐ কর্মগুলো সম্পাদন করে। ওযুর ফরয বা রুকন ছয়টি যা নিম্নরূপ:

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা।

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা।
৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।
৫. ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।
৬. ওযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

ওযুর শর্তসমূহঃ

ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য দশটি শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. ওযুকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফির বা মুশরিক ওযু করলেও তার ওযু শুদ্ধ হবে না। তাই সে ওযু বা গোসল করে কখনো পবিত্র হতে পারবে না।
২. ওযুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের ওযু শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ না তাদের চেতনা ফিরে আসে।
৩. ওযুকারী ভালমন্দ ভেদাভেদজ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের ওযু শরীয়তে ধর্তব্য নয়। তাদের ওযু করা-না করা সমান।
৪. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত ওযু গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫. ওযু শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে। অতএব ওযু চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে ওযু শুদ্ধ হবে না।
৬. ওযু চলাকালীন ওযু ভঙ্গের কোন কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে ওযু তৎক্ষণাৎই ভেঙ্গে যাবে।
৭. ওযুর পূর্বে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকলে ঢেলাকুলুপ বা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।
৮. ওযুর পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।
৯. ওযুর অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছুতে বাধা প্রদান করে এমন বস্তু অপসারণ করতে হবে।
১০. ওযু ভঙ্গের কারণ সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে এমন ব্যক্তির জন্য নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হতে হবে। অর্থাৎ নামাযের সময় হলেই কেবল এমন ব্যক্তিরা ওযু করবে।

সমাপ্ত

نواقض الوضوء
ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ :

ওযু করার পর নিম্নোক্ত কারণগুলোর কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. মল-মূত্রদ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে:

বায়ু, বীর্য, মযী, ওদী, ঋতুস্রাব, নিফাস ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বস্তু মল বা মূত্রদ্বার দিয়ে বের হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

অর্থাৎ তোমাদের কেউ বাথরুম থেকে মলমূত্র ত্যাগ করে আসলে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে (পানি পেলে ওযু বা গোসল করে নিবে) অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। (মায়িদাহ : ৬)

সাফ্ওয়ান্ বিন 'আস্সাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ বা ঘুম যাওয়ার কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন। বরং মোজার উপর মাস্হ করতে বলতেন। তবে শুধু জানাবাতের গোসলের জন্য মোজা খুলতে বলতেন। (তিরমিযী, হাদীস ৯৬ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৩)

'আব্বাদ বিন তামীম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার চাচা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, কারো কারোর ধারণা হয় নামাযের মধ্যে ওযু নষ্ট হয়েছে বলে। তখন তাকে কি করতে হবে? তিনি বললেন:

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً

অর্থাৎ সে নামায ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনধ্বনি বা দুর্গন্ধ পায়। (বুখারী, হাদীস ১৩৭ মুসলিম, হাদীস ৩৬১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৫১৯)

২. ঘুম বা অন্য যে কোন কারণে অবচেতন হলে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

অর্থাৎ চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের পাহারাদার। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে তাকে অবশ্যই ওযু করতে হবে। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৩ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৮২)

এ ছাড়া উন্মাদনা, সংজ্ঞাহীনতা ও মত্ততা ইত্যাদির কারণে চেতনাশূন্যতা দেখা দিলেও সকল আলেমের ঐকমত্যে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

৩. কোন আবরণ ছাড়াই হাত দিয়ে লিঙ্গ বা গুহ্যদ্বার স্পর্শ করলে।

উম্মে হাবিবা ও আবু আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি:

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন ওযু করে নেয়। (ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৬, ৪৮৭ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১১১৪, ১১১৫, ১১১৭)

৪. উটের গোস্ত খেলে।

বারা' বিন 'আযিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: لاَ تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে উটের গোস্ত খেয়ে ওযু করতে হবে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: উটের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে। তেমনিভাবে তাঁকে ছাগলের গোস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ ছাগলের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ১৮৪ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৯৯)

৫. মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছে যে) হয়ে গেলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (মায়িদাহ : ৫)

সমাপ্ত

موجبات الغسل

যখন গোসল করা ফরয:

নিম্নোক্ত চারটি কারণের যে কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে যে কোন পুরুষ বা মহিলার উপর গোসল করা ফরয। উপরন্তু মহিলাদের গোসল ফরয হওয়ার জন্য আরো দু'টি বাড়তি কারণ রয়েছে। সে কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে:

উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। তেমনিভাবে স্বপ্নদোষ হলেও। তবে তাতে উত্তেজনার কথা মনে থাকা শর্ত নয়।

আবু সাঈদ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়। (মুসলিম, হাদীস ৩৪৩)

২. স্ত্রীসহবাস করলে:

স্ত্রীসঙ্গম করলে গোসল করতে হয়। বীর্যপাত হোক বা নাই হোক।

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এবং পুরুষের লিঙ্গাগ্র স্ত্রীর যোনিদ্বারকে অতিক্রম করে (বীর্যপাত হোক বা নাই হোক) তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম, হাদীস ৩৪৯)

৩. কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে। চাই সে আদতেই কাফির থেকে থাকুক অতঃপর মুসলমান হয়েছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ (পুনরায় কাফির) হয়ে অতঃপর মুসলমান হয়েছে।

ক্বাইস্ বিন 'আসিম্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

অর্থাৎ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি

আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৫ তিরমিযী, হাদীস ৬০৫ নাসায়ী, হাদীস ১৮৮)

৪. যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ ব্যতীত যে কোন মুসলমান ইন্তেকাল করলে।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ، وَ سِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً

অর্থাৎ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর সাথেই হজ্জ মৌসুমে আরাফায় অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে উট থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর সে মারা গেলে তার ব্যাপারটি রাসূল ﷺ এর কর্ণগোচরে আনা হলে তিনি বলেন: তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। অতঃপর তাকে খোশবু লাগিয়ে ইহ্রামের কাপড় দু'টিতেই কাফন দিয়ে দাও। কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়্যাহ্ পড়াবস্থায়ই পুনরুত্থিত করবে। (বুখারী, হাদীস ১২৬৬ মুসলিম, হাদীস ১২০৬)

৫. মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে। তবে গোসল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পূর্ব শর্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

অর্থাৎ তারা (সাহাবারা) আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে ; আপনি বলুন: তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখনই তোমরা তাদের সাথে সম্মুখ পথে সহবাস করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালবাসেন। (বাকারাহ্ : ২২২)

৬. নিফাস বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব নির্গত হলে।

তবে নিফাস থেকে গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়া পূর্ব শর্ত। নিফাস ঋতুস্রাবের ন্যায়। বরং তা ঋতুস্রাবই বটে। বাচ্চাটি মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার নাভিকূপের মধ্য দিয়ে তন্ত্রী যোগে এ ঋতুস্রাবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তাই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঋতুস্রাবটুকু কোন বিতরণক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন যোনিপথে বের হয়ে আসছে। নিফাস সন্তান প্রসবের সাথে সাথে অথবা উহার পরপরই বের হয়। তেমনিভাবে সন্তান প্রসবের এক দু' তিন দিন পূর্বে থেকেও প্রসব বেদনার সাথে বের হয়। শরীয়তের পরিভাষায় ঋতুস্রাবকেও নিফাস বলা হয়।

সমস্ত আলেম সম্প্রদায় নিফাসের পর গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত।

সমাপ্ত

صفة الصلاة

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

অর্থাৎ তোমরা নামায পড়ো যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো।

নামায আদায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতি:

নামায পড়ার পূর্বে সর্বপ্রথম (ওযু, গোসল কিংবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্রতার্জন করবে। এমতাবস্থায় নামাযীর শরীর, কাপড় ও নামাযের জায়গা পবিত্র হতে হবে।

১. কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পুরাপুরি মনোযোগী ও ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে নামায পড়ার ইচ্ছা তা সঠিকভাবে মনে করে উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আক্বার" বলে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে কব্জি ধরে উভয় হাত বুকের উপর রাখবে।

মুখে নামাযের নিয়্যাত না রাসূল ﷺ করেছেন, না খুলাফায়ে রাশিদীন, না ইসলামের প্রসিদ্ধ ইমামগণ।

ইমাম সাহেব ও একাকী নামায আদায়কারী নিজেদের সামনে তথা ক্বিব্লার দিকে একটি "সুত্রাহ্" তথা আধা হাত সমপরিমাণ কোন কিছু খাড়া করে রাখবে। তা করা সুন্নাত।

২. বুক থেকে চিবুক একটু দূরে রেখে মাথা খানা খানিকটা ঝুঁকিয়ে সাজ্দাহ্'র জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

৩. এরপর নিম্নোক্ত দো'আটি পড়বে:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি আমি ও আমার গুনাহ্'র মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করুন যতটুকু দূরত্ব রয়েছে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করুন যেভাবে পবিত্র করা হয়ে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্গুলো ধুয়ে দিন পানি, বরফ ও শিলা বৃষ্টি দিয়ে। (বুখারী, হাদীস ৭৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৯৮)

অথবা বলবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি । আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মর্যাদা অতিশয় সুউচ্চ। আপনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ৭৭৫ তিরমিযী, হাদীস ২৪৩)

৪. "আ'ঊযু বিল্লাহ্", "বিস্মিল্লাহ্" বলে সূরা ফাতিহা পুরোটা পড়ে উচ্চ স্বরে "আমীন" বলবে এবং এরই পাশাপাশি অন্য যে কোন সূরা কিংবা উহার সমপরিমাণ কয়েকটি আয়াত পড়বে। তবে তা ফজরের নামাযে বড়ো তথা সূরা "ক্বাফ" ও সূরা "নাবা" এর মধ্যকার কোন একটি সূরা, মাগরিবের নামাযে ছোট তথা সূরা "যু'হা" ও সূরা "নাস্" এর মধ্যকার কোন একটি সূরা এবং অন্যান্য নামাযে মাঝারি তথা সূরা "নাবা" ও সূরা "যু'হা" এর মধ্যকার কোন একটি সূরা হওয়া ভালো। তবে কখনো কখনো ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাযও বড়ো সূরা দিয়ে পড়া যেতে পারে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই করেছেন।

৫. উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আক্বার" বলে রুকুতে যাবে। রুকুতে পিঠ ও মাথা সমান এবং উভয় হাত হাঁটুর উপর প্রসারিত থাকবে। রুকুতে প্রশান্তির সাথে তিন বা তিনের অধিক বার বেজোড় সংখ্যায় বলবে: "সুব্হানা রাব্বিয়াল-'আযীম" অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর পাশাপাশি আরো বলবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

অথাৎ হে আমাদের প্রভু! হে আল্লাহ্! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (বুখারী, হাদীস ৭৯৪ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ ও জিব্রীলের প্রভু অতি পবিত্র। (মুসলিম, হাদীস ৪৮৭)

৬. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঁচিয়ে ইমাম ও একা নামায আদায়কারী বলবে:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। (বুখারী, হাদীস ৭৩২ মুসলিম, হাদীস ৪১১)

৭. এ সময় ডান হাত বাম হাতের উপর বুকে রেখে মুক্তাদি ও একা নামায আদায়কারী বলবে:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! অথবা হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই আমাদের সকল প্রশংসা। (বুখারী, হাদীস ৭৩২, ৭৮৯, ৭৯৫, ৭৯৬ মুসলিম, হাদীস ৪০৯, ৪১১)

৮. আরো বলবে:

حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ! لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থাৎ (হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই আমাদের সকল প্রশংসা) বরকতময় ও পবিত্র অনেক অনেক প্রশংসা। আকাশ, জমিন ও অন্যান্য সকল বস্তু যা আপনি চান তা সমপরিমাণ। আপনি হচ্ছেন সকল স্তুতি-বন্দনা ও সম্মানের অধিকারী! বান্দাহ্ আপনার শানে যতটুকুই স্তুতি-বন্দনা করুক তা সবটুকুরই আপনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আর আমরা সবাই তো আপনারই বান্দাহ্। হে আল্লাহ্! আপনার দানে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। আপনার নিষেধ উপেক্ষা করে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। কোন ধনবান ব্যক্তির ধন-দৌলত তাকে আপনার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারী, হাদীস ৭৯৯ মুসলিম, হাদীস ৪৭৭, ৪৭৮)

৯. সাজ্দাহ্'র জন্য "আল্লাহু আক্বার" বলে প্রথমে দু' হাঁটু অতঃপর দু' হাত এবং কপাল ও নাক জমিনে রাখবে। মনে রাখবে যেন সাজ্দাহ্টি সর্বমোট সাতটি অঙ্গের উপর হয়। তা হচ্ছে, কপাল ও নাক, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পায়ের আঙ্গুল সমূহ। সাজ্দাহ্'র সময় হাতের উভয় কনুইকে জমিন ও উভয় হাঁটু থেকে দূরে রাখবে। তেমনিভাবে উভয় বাহুকে উভয় পার্শ্ব থেকে এবং পেটকে উভয় রান থেকে দূরে রাখবে। উপরন্তু পিঠকে একেবারে লম্বা করে সিজ্দাহ্ দিবে না যাতে শরীরের পুরো ভারটুকু কপালের উপর না পড়ে। এ সময় উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিব্লামুখী, স্বাভাবিক ও মিলানো থাকবে। তবে হাত দু'টো কাঁধ বা কান বরাবর রাখবে। গোড়ালি দু'টো একটি আরেকটির সাথে মিলিয়ে রাখবে।

১০. সাজ্‌দায় গিয়ে প্রশান্তির সাথে তিন বা তিনের অধিক বার বেজোড় সংখ্যায় বলবেঃ "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল-আ'লা" অর্থাৎ আমি আমার সুমহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর পাশাপাশি রুকুর বাকি দো'আ দু'টোও পড়বে এবং তাতে নিজের ও দুনিয়ার সকল মোসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ কামনা করবে। কারণ, তাতে দো'আ কবুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

অর্থাৎ জেনে রাখো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু বা সাজ্‌দাহ্ অবস্থায় কুর'আন তিলাওয়াত করতে। অতএব রুকু অবস্থায় তোমরা প্রভুর মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সাজ্‌দাহ্ অবস্থায় বেশি বেশি দো'আ করবে। কারণ, তাতে দো'আ কবুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ৪৭৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

অর্থাৎ সাজ্‌দাহ্ অবস্থায় বান্দাহ্ সব চাইতে বেশি নিজ প্রভুর নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা তাতে বেশি বেশি দো'আ করো। (মুসলিম, হাদীস ৪৮২)

১১. "আল্লাহু আক্‌বার" বলে সাজ্‌দাহ্ থেকে উঠে ডান পা খাড়া করে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর স্থির হয়ে বসবে। এমতাবস্থায় ডান হাত ডান রান বা হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম রান বা হাঁটুর উপর রাখবে। তবে ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে অথবা মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে রিংয়ের রূপ সৃষ্টি করবে। আর শাহাদাত অঙ্গুলিটি খোলা রেখে তা দো'আর প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের সময় উঠাবে। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত দো'আগুলো বলবে:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ **বা** اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে সুস্থ করুন, আমাকে হিদায়েত দিন ও আমাকে রিযিক দিন। (আবু দাউদ, হাদীস ৮৫০ ইব্‌নু

মাজাহ্, হাদীস ৮৯৭, ৮৯৮)

১২. "আল্লাহু আক্বার" বলে দ্বিতীয় সাজ্দাহ্ করবে যেভাবে প্রথম সাজ্দাহ্ করেছে।

১৩. "আল্লাহু আক্বার" বলে উভয় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য উঠবে। প্রয়োজনে দু' হাতের উপর ভর দিয়েও উঠা যেতে পারে। দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য উঠার পূর্বে প্রয়োজনে সামান্য সময়ের জন্য বসাও যেতে পারে। যা রাসূল ﷺ শেষ বয়সে করেছেন। কেউ সর্বদা তা করলেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। দ্বিতীয় রাক্'আতে তাই করবে যা প্রথম রাক্'আতে করেছে। তবে তাতে প্রথম রাক্'আতের শুরুতে যে দো'আটি তথা সানা পড়েছে তা আর পড়বে না। তেমনিভাবে সূরা ফাতিহার শুরুতে "আ'উযু বিল্লাহ্" না বললেও চলবে।

১৪. দ্বিতীয় রাক্'আত শেষে "আল্লাহু আক্বার" বলে স্থির হয়ে বসবে যেমনিভাবে বসেছে দু' সাজ্দাহ্'র মাঝখানে। অতঃপর বলবে:

اَلتَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থাৎ সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। (হে নবী) আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্'র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। তেমনিভাবে আমাদের উপর ও আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাহ্দের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও তদীয় রাসূল। (বুখারী, হাদীস ৮৩১ মুসলিম, হাদীস ৪০২)

এরপর বলবে:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি মোহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দয়া করুন যেমনিভাবে আপনি দয়া করেছেন ইব্রাহীম عليه السلام ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত সম্মানিত। হে আল্লাহ্!

আপনি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে বরকত দিন যেমনিভাবে আপনি বরকত দিয়েছেন ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত সম্মানিত। (বুখারী, হাদীস ৩৩৭০ মুসলিম, হাদীস ৪০৬)

আরো বলবে:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব, মাসীহ্ নামক দাজ্জালের ফিৎনা এবং জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা থেকে। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহ্ ও ঋণ থেকে। (বুখারী, হাদীস ৮৩২ মুসলিম, হাদীস ৫৮৮, ৫৮৯)

এরপর নিজের ও দুনিয়ার সকল মোসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ কামনা করবে।

১৫. যদি নামাযটি তিন বা চার রাক্'আত বিশিষ্ট হয় তা হলে প্রথম "তাশাহ্হুদ" তথা "আত্তাহিয়্যাতু" শেষ করে "আল্লাহু আক্বার" বলে তৃতীয় রাক্'আতের জন্য দাঁড়িয়ে উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। অতঃপর বাকি এক বা দু' রাক্'আত দ্বিতীয় রাক্'আতের মতোই পড়বে। তবে তাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাবে না। কখনো কখনো কোন সূরা বা আয়াত মিলালেও তাতে কোন অসুবিধে নেই।

১৬. যদি নামাযটি তিন বা চার রাক্'আত বিশিষ্ট হয় তাহলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাক্'আত শেষ করে দ্বিতীয় "তাশাহ্হুদ" তথা "আত্তাহিয়্যাতু" পড়ার জন্য ডান পা খাড়া করে বাম পা ডান পায়ের জঙ্ঘার নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে জমিনের উপর পাছা লাগিয়ে বসবে অথবা উভয় পা ডান দিক থেকে বের করে দিবে এবং জমিনের উপর বিছিয়ে রাখবে আর বাম পা ডান পায়ের জঙ্ঘার নিচ দিয়ে বের করে দিবে কিংবা ডান পা বিছিয়ে রাখবে এবং বাম পা ডান পায়ের জঙ্ঘা ও রানের মাঝখানে রাখবে। এরপর "তাশাহ্হুদ" তথা "আত্তাহিয়্যাতু", দরূদ ও উপরে উল্লিখিত দো'আটি পড়বে এবং নিজের ও দুনিয়ার সকল মোসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্" বলে ডানে ও বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

সমাপ্ত

حقيقة العلمانية في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة:

কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদঃ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এমন মতবাদ যা যে কোন ব্যাপারে যে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব না করা তথা যে কোন ধর্মের নিয়ন্ত্রণ কিংবা অনুশাসন না মানার প্রতি আহ্বান করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীরা কিন্তু উক্ত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয়। কারণ, তাদের অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন ধর্মের কিছু না কিছু অনুশাসন মেনে চলে। তাই তাদের অনেককেই কখনো কখনো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুর'আন তিলাওয়াত কিংবা অমূলক কেচ্ছা ও ফযীলত সর্বস্ব ওয়ায মাহফিল ও বয়ান শুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। অতএব পারিভাষিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে এমন মতবাদকে বুঝানো হয় যে মতবাদে যে কোন ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোথাও নয়। তাদের মতে যে কোন রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। অন্য কথায় যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব কিংবা ব্যবহার করে না। যদিও কোন কোন রাষ্ট্র কিংবা প্রশাসন জনগণের কঠিন চাপের মুখে কোন না কোন সময় যে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করে। তবে মনে রাখতে হবে এ জাতীয় ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নীতিগত নয় বরং তা চাপের মুখে।

তাই বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নতুন দর্শন ও একটি নতুন বিপ্লব। যা তার ভক্তদেরকে রাষ্ট্র থেকে যে কোন ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখে একমাত্র দুনিয়ার ক্ষণিকের ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার সবক শিখায়। তাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দুনিয়া। তাদের অধিকাংশই আখিরাত ও আখিরাতের যে কোন কর্মকাণ্ডের প্রতি তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করে না। তাই এদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوْبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِيْ الْحِرَاسَةِ كَانَ فِيْ الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

অর্থাৎ ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক-পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)। জান্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য যে সর্বদা আল্লাহ্'র রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরেই আছে। মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো। পা যুগল ধূলিমলিন। সেনাবাহিনীর পাহারায় দিলেও রাজি। পশ্চাতে দিলেও রাজি। উপরস্থদের নিকট অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। (বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাক্বী : ৯/১৫৯, ১০/২৪৫)

সর্বদা কেউ দুনিয়া কামানোর নেশায় মত্ত থাকলে দুনিয়া যে নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণরূপে তার হাতে ধরা দিবে তাও কিন্তু সঠিক নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যতটুকু দিতে চাবেন সে ততটুকুই পাবে। এর বেশি কিছু সে পাবে না। আর ভাগ্যক্রমে সে তার চাহিদানুযায়ী দুনিয়ার সবটুকু পেলেও পরকালে তার জন্য নির্ধারিত থাকবে শুধু জাহান্নাম এবং তার সকল আমল বাতিল বলেই গণ্য হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পার্থিব কোন সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা অতিসত্বর দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তার জন্য নির্ধারিত করে রাখি জাহান্নাম। যাতে সে প্রবেশ করবে অপমানিত ও লাঞ্ছিতভাবে। (ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : ১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ যারা পার্থিব জীবন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমি তাদের কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেবো। এতটুকুও তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরা এমন যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে। (হূদ: ১৫, ১৬)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যখন দুনিয়াকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে চাই তা শরীয়ত সম্মত হোক বা নাই হোক তখন শরীয়তের কোন অনুশাসন তাদের স্বার্থ বিরোধী হলেই তারা তা কখনো আইনগতভাবে রহিত করবে অথবা কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে বলবে।

অতএব বলতে হয়, যারা বিচারের ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানকেই প্রাধান্য দেয় এবং শরীয়তের বিধি-বিধানকে রহিত করে তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যারা হারাম বস্তুসমূহ যেমনঃ ব্যভিচার, মদ্যপান, গানবাদ্য কিংবা সুদী কাজ-কারবার ইত্যাদি সমাজে চালু করে এ মনে করে যে, এগুলো নিষেধ করলে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবে তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যারা শরীয়তের দণ্ডবিধি তথা হত্যাকারীকে হত্যা, ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত করা অথবা সে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা, মদপানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করা, চোরের হাত কাটা কিংবা সন্ত্রাসীকে হত্যা করা, ফাঁসী দেয়া, বিপরীতভাবে তার হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা তাকে দূরের কোন জেলে আটকে রাখা ইত্যাদি অস্বীকার করে কিংবা আইনগতভাবে নিষেধ করে এ মনে করে যে, এগুলো বাস্তবায়ন করা বিশ্রী, কঠোরতা ও মানবতা বিরোধী তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যখন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া আর কোথাও কোন ধর্মের স্বীকৃতি দেয় না তাই তা হচ্ছে একটি শির্কী ও কুফরি মতবাদ। কারণ, তাতে যেমন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোন স্বীকৃতি দেয়া হয় না তথা এ সকল ব্যাপারে শরীয়তের বিধানের প্রতি কুফরি করা হয় তেমনিভাবে এ সকল ক্ষেত্রে সংসদ বা আইন পরিষদকে আইন বা বিধান রচনার অধিকার দেয়া হয় তথা এ সকল ব্যাপারে সাংসদ ও আইনজ্ঞদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার করা হয় তাই তা একই সময়ে কুফরি এবং শির্ক।

একজন মোসলমান তার জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামের সমূহ বিধি-বিধান মানতে বাধ্য। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনিই তো স্রষ্টা। অতএব তিনিই একমাত্র বিধানদাতা। আর অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ধর্ম। (আলি-'ইমরান : ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ যে কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই গ্রহনযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আলি- 'ইমরান : ৮৫)

নিজের ইচ্ছা মাফিক কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মকে মানা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা এটা মূলতঃ ইহুদিদেরই চরিত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো আর কিয়দংশ অবিশ্বাস করো। তোমাদের মধ্যে যারা এমন করবে তাদের জন্য এ পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরন্তু তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির প্রতি সোপর্দ করা হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মের প্রতি কখনোই গাফিল নন। (বাক্বারাহ্ : ৮৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফরি ও শির্কী চেতনা থেকে রক্ষা করুন। 'আমীন! ইয়া রাব্বাল-'আলামীন।

সমাপ্ত

حقيقة القومية في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة

কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জাতীয়তাবাদঃ

জাতীয়তাবাদ মানে এমন একটি মতবাদ যা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বজাতিচেতনা কিংবা স্বজাতিপ্রীতি ধারণ করার আহ্বান জানায়। এতে সত্য কিংবা ন্যায়ের কোন ধার ধারা হয় না। বরং তাতে সাধারণত মানুষের যে কোন সমষ্টিগত জীবনে বিশেষত রাজনৈতিক জীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। চাই তা সঠিক হোক কিংবা বেঠিক।

মূলতঃ উক্ত মতবাদটি খ্রিস্টানদেরই সৃষ্ট একটি মতবাদ। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে যার বিপুল বিস্তারের মাধ্যমে তারা ইসলামকেই ধ্বংস করার মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বলতে হয়, এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় তারা প্রায় অধিকাংশটুকুই সফলকাম। ধারণা করা হয়, তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপেও সফল হতো যদি না মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতেন। এ জন্যই তো বর্তমান যুগের খ্রিস্টান মোড়লরা এ সহজবোধ্য ও প্রকৃতিগত চেতনাটুকুকে সর্বদা এ বিশ্বের বুকে অটুট রাখার জন্য যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে চাকচিক্যময় ধোঁকাপূর্ণ খেয়ালী কথার ফুলঝুরির মাধ্যমে অনবরত সাহস ও মনোবল যোগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, এ প্রচেষ্টায় যেমন ইসলাম ধর্ম ধীরে ধীরে বিশ্বের বুকে তার অদম্য শক্তি হারাবে ; টিকে থাকবে শুধু তার নামটুকু তেমনিভাবে কোন এলাকায় কারোর জন্য তাদের খ্রিস্টধর্মের এমনকি অন্য যে কোন ধর্মের গতিরোধ করাও কোনভাবেই সম্ভব হবে না। এদের খপ্পরে আজ আরব-অনারব তথা বিশ্বের অধিকাংশ মোসলমানই নিপতিত। এতে করে বিশ্বের সকল ইসলাম বিদ্বেষী ও কাফির শক্তি খুবই আনন্দিত।

আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী প্রতিটি মোসলমানের জানা উচিৎ যে, এ জাতীয়তাবাদের ডাক হচ্ছে ইসলাম ও মোসলমানকে ধ্বংস করার জন্য মহা ষড়যন্ত্রমূলক একটি পরিকল্পিত অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর প্রকাশ্য অন্যায়মূলক জাহিলী যুগের বাতিল ডাক। যা নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টের মাধ্যমে সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ্।

১. মুসলিম বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন জাতীয়তাবাদী ডাক মোসলমানদের আন্তর্জাতিক মহা ঐক্যের গোড়ায় একটি মারাত্মক কুঠারাঘাত। যা বিশ্বের সকল মোসলমানকে অঞ্চল ও ভাষাগতভাবে ভিন্ন

ভিন্ন জাতি-সত্তায় রূপান্তরিত করে। তখন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য যে কোন মুসলিম জাতির সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আর যে কোন চিন্তা-চেতনা মোসলমানদের মধ্যে দলাদলি কিংবা ফাটল সৃষ্টি করে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ, ইসলাম সর্বদা তার অনুসারীদেরকে মহান ঐক্যের দিকেই ডাকে ; দলাদলির দিকে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾

অর্থাৎ তোমরা সবাই এক হয়ে এক আল্লাহ্'র রজ্জু শক্ত হাতে ধারণ করো। কখনো নিজেদের মধ্যে দলাদলি করো না। (আলি-'ইমরান : ১০৩)

২. ইসলাম জাহিলী যুগের সকল প্রকারের ডাক প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি জাহিলী যুগের সকল কর্মকাণ্ড এবং চাল-চরিত্রকেও। তবে ইসলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাহিলী যুগের কিছু উন্নত চরিত্র ও কর্মকাণ্ডকে সাপোর্ট করে। যা নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে এ জাতীয়তাবাদী ডাক হচ্ছে জাহিলী ডাক।

আল্লামাহ্ শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইসলাম ও কুর'আনের ডাক ছাড়া যে কোন ডাক চাই তা যে কোন বংশের দিকে হোক অথবা যে কোন অঞ্চল, জাতি, মাযহাব ও তরীকার দিকে তা সবই জাহিলী ডাক। বরং যখন একদা এক যুদ্ধে জনৈক মুহাজির সাহাবী জনৈক আন্সারী সাহাবীর পাছায় তার হাত দিয়ে আঘাত করে তখন আন্সারী সাহাবী সকল আন্সারীগণকে ডাক দিয়ে বললোঃ হে আন্সারীগণ! তোমরা কোথায়? দ্রুত আমার সহযোগিতায় নেমে আসো। তখন মুহাজির সাহাবীও বললো: হে মুহাজিরগণ! তোমরা কোথায়? দ্রুত আমার সহযোগিতায় নেমে আসো। রাসূল ﷺ এ জাতীয় ডাক শুনে বললেন:

مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ ! قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

অর্থাৎ এ কি হচ্ছে। জাহিলী ডাক শোনা যাচ্ছে কেন? সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! জনৈক মুহাজির সাহাবী জনৈক আন্সারী সাহাবীর পাছায় তার হাত দিয়ে আঘাত করে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ জাতীয় ডাক ছাড়ো। কারণ, তা একটি অতি ঘৃণ্য ডাক। (বুখারী, হাদীস ৪৯০৫ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৪)

৩. যে কোন জাতীয়তাবাদী ডাক সে জাতির কাফির ও মুশ্‌রিকদেরকে ভালোবাসার একটি বিরাট মাধ্যম। কারণ, সময় সময় জাতীয়তাবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। যার কারণে তারা একদা নিজের প্রাণের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়। এ দিকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈমান বিধ্বংসী একটি বিশেষ কারণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যালিম সম্প্রদায়কে কখনোই সঠিক পথ দেখান না। যাদের অন্তরে মুনাফিকির ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদের অনেককেই দেখবে তারা কাফিরদের প্রতি দ্রুত দৌড়ে যায়। তারা বলেঃ আমাদের ভয় হচ্ছে আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি? আশা তো অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা মোসলমানদেরকে পূর্ণ বিজয় দিবেন অথবা তিনি নিজ পক্ষ থেকে কোন সুবিধা বের করে দিবেন। তখন তোমরা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের জন্য লজ্জিত হবে। (মায়িদাহ্ : ৫১-৫২)

আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত ফরমান কতই না সুন্দর, সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত সত্য। বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল অনেকেই এমন ধারণা করে যে, আমরা যদি কাফির তথা ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, ধর্ম বিদ্বেষী ও মুসলিম সবাই মিলে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা নিয়ে একই ব্যানারের অধীনে একতাবদ্ধ না হই তাহলে একদা শত্রু পক্ষ আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে, আমাদের সকল সম্পদ তারা ছিনিয়ে নিবে এবং আমাদের উপর সমূহ বিপদ নেমে আসবে।

এ জন্যই তো দেখা যায়, যে কোন ধর্ম, মত ও পন্থার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ উক্ত জাতীয়তাবাদের ব্যানারের অধীনে সবাই একে অপরের খাঁটি বন্ধু ; অথচ এ চেতনা সরাসরি কুর'আন ও শরীয়ত পরিপন্থী এবং এ

ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালার দেয়া সুস্পষ্ট সীমারেখার সরাসরি লঙ্ঘন। শরীয়ত বলেঃ ঈমানদার সে যে কোন দেশ ও বর্ণের হোক না কেন তাকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং কাফির সে যে কোন দেশ ও বর্ণের হোক না কেন তাকে অবশ্যই শত্রু ভাবতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো ; অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। উপরন্তু তারা রাসূল ও তোমাদেরকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দিয়েছে এ কারণে যে, তোমরা নিজ প্রভুর উপর ঈমান এনেছো। তোমরা যদি সত্যিই আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো এবং একমাত্র আমার সন্তুষ্টিই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে আর এমন করতে যেয়ো না। আমি দেখছি, তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো ; অথচ আমি তোমাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবই জানি। যে ব্যক্তি এমন করবে সে অবশ্যই সত্য পথভ্রষ্ট। (মুম্‌তা'হিনাহ্ : ১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন সম্প্রদায়কে এমন পাবে না যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের প্রকাশ্য বিরোধীদেরকে ভালোবাসবে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান, ভাই-বোন কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হোক না কেন। এ জাতীয় মানুষদের অন্তরেই

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন নিজ রহ্মত ও সাহায্য দিয়ে। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে অনেকগুলো নদ-নদী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও থাকবে তাঁর উপর সর্বদা সন্তুষ্ট। এরাই হলো একান্ত আল্লাহ্'র দল। আর আল্লাহ্'র দলই তো হবে সর্বদা সফলকাম। (মুজাদালাহ্ : ২২)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম عليه السلام ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ; তাঁরা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা এবং আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা এ মুহূর্তে বয়কট করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনো। (মুম্তাহিনাহ্ : ৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কখনো কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এরই মাধ্যমে নিজেদের শাস্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার হাতে কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য তুলে দিতে চাও। (নিসা' : ১৪৪)

এ দিকে মোসলমানদের শত্রুর বিপক্ষে কাফির ও মুশ্রিকদের সহযোগিতা তাদের জন্য কখনোই নিরাপদ নয়। এ জন্যই তো আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে জনৈক মুশ্রিক বারবার তাঁর সহযোগিতা করতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি যতক্ষণ না সে মোসলমান হয়।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর অভিমুখে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তিনি "ওয়াবারাহ্" তথা বর্তমানের "হার্‌রাহ্ গারবিয়্যাহ্" নামক এলাকায় পৌঁছুলে তাঁর নিকট জনৈক প্রসিদ্ধ বীর উপস্থিত হয়। যাকে দেখে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। উক্ত ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললো: আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী? সে বললো: না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি চলে যাও। আমি কখনোই কোন মুশ্‌রিকের সহযোগিতা নিতে পারি না। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: এ কথা শুনে লোকটি চলে গেলো। তিনি বলেন: যখন আমরা (সাহাবায়ে কিরাম) "শাজারাহ্" নামক এলাকায় পৌঁছুলাম তখন লোকটি আবারো এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একই প্রস্তাব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাকে একই উত্তর দিলেন। এরপর লোকটি চলে গেলো। ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "বাইদা'" নামক এলাকায় পৌঁছুলে লোকটি আবারো এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একই প্রস্তাব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী? সে বললো: হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: তা হলে তুমি আমাদের সাথে চলতে পারো। (মুসলিম, হাদীস ১৮১৭)

তাদেরকে আমরা কিভাবেই বা বিশ্বাস করবো ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে তথা মোসলমানদেরকে ছেড়ে অন্য কাউকে খাঁটি বন্ধু কিংবা পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করো না। কারণ, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এতটুকুও সঙ্কোচবোধ করবে না। তোমাদের বিপর্যয়ই তাদের একান্ত কাম্য। ইদানিং তাদের মুখ থেকেই শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকে আন্দায করা যায়, তাদের অন্তরে লুক্কায়িত শত্রুতা আরো কতোই না ভয়ানক। আমি তোমাদের জন্য আমার সকল নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি। যদি তোমরা সত্যিই বুদ্ধিমান হয়ে থাকো তা হলে তোমরা তা অবশ্যই বুঝবে। (আলি-'ইমরান : ১১৮)

কাফির ও মুশ্‌রিকরা কখনো মোসলমানদের পক্ষ হয়ে তাদের শত্রুর

বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তা কখনোই মোসলমানদের জন্য সামগ্রিক অর্থে কোন ধরনের কল্যাণই বয়ে আনবে না। উপরন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোন ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করলে তা একান্ত ক্ষতিরই কারণ হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَـٰسِرِينَ ۝١٤٩ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য করো তা হলে তারা তোমাদেরকে অবশ্যই পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিবে। তখন তোমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। (আলি-'ইমরান : ১৪৯-১৫০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَـٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾

অর্থাৎ যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তা হলে তারা তোমাদের কোন লাভ তো করতোই না বরং তারা তোমাদের মাঝে আরো ফাসাদ বাড়িয়ে দিতো। আর এ ব্যাপারে তারা এতটুকুও ত্রুটি করতো না। তারা তো তোমাদের মাঝে সর্বদা ফিতনাই কামনা করে। উপরন্তু তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের বহু গোয়েন্দা। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (তাওবাহ্ : ৪৭)

বস্তুতঃ মু'মিন মু'মিনেরই বন্ধু এবং কাফির কাফিরেরই বন্ধু। কাফির কখনো মু'মিনের বন্ধু হতে পারে না। কুর'আন নির্দেশিত উক্ত নিয়ম ভঙ্গ করলে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না। উপরন্তু এ জাতীয় মু'মিরা আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। নামায

কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে। এঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় পরাক্রমশালী অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। (তাওবাহ্ : ৭১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾

অর্থাৎ এ দিকে কাফিররা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি উপরোক্ত শত্রুতা ও মিত্রতার বিধান কার্যকর না করো তা হলে এ পৃথিবীতে কঠিন ফিতনা ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (আন্ফাল : ৭৩)

বর্তমান বিশ্বে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া উক্ত বিধান কার্যকর না হওয়ার দরুনই আজ দেখা যাচ্ছে হরেক রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও রং বেরংয়ের মহা বিপর্যয়। মোসলমানদের মধ্যেই আজ দেখা যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ-সংশয়। আজ তারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। উপরন্তু তারা দিনদিন বাতিল ও বাতিলপন্থীদের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। আরো কতো কি।

এ যুগে নামধারী আলিমদেরকে কিনতে পাওয়া যায়। তাই আজ বাতিল পন্থীরা এদের মাধ্যমে নিজেদের বাতিলকে সমাজে সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুর'আন ও হাদীসের ঠুনকো লেবেল লাগানোয় ব্যস্ত। এ জন্যই দেখতে পাবেন, আজ দুনিয়ার বুকে এমন কোন বাতিল পন্থী নেই যাদের সাথে নামধারী কোন না কোন আলিম সম্পৃক্ত নয়। তাই আলিম নামধারী কোন না কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

অর্থাৎ তুমি দুনিয়ার মানুষদের মাঝে মু'মিনদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে ইহুদি ও মুশ্রিকদেরকে। আর মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী পাবে ওদেরকে যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে দাবি করে। আর তা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে কিছু জ্ঞানপিপাসু ও

সংসারত্যাগী এবং তারা অহঙ্কারীও নয়। (মায়িদাহ্ : ৮২)

তারা বলতে পারে, উক্ত আয়াত খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব জায়িয হওয়া প্রমাণ করে।

মনে রাখতে হবে, কোন আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া জাহান্নামী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই উক্ত আয়াতকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের সাথে মিলালে যে মর্ম উদ্ঘাটিত হয় তা হচ্ছে, খ্রিস্টানদের কেউ কেউ উন্মুক্ত পড়াশুনা, নম্রতা ও সংসারত্যাগী স্বভাব ও মনোভাবের দরুন খাঁটি ঈমানদার ও মোসলমানদের উন্নত চরিত্র তথা মানবতাবোধে অভিভূত হয়ে তাদের সাথে সখ্যতা গড়ার নিকটবর্তী হতে পারে। যা ইহুদি ও মুশ্রিকদের থেকে কখনোই কল্পনা করা যায় না। উক্ত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, খ্রিস্টানরা মু'মিনদের বন্ধু হয়ে যাবে, না মু'মিনগণ খ্রিস্টানদের বন্ধু হবে। এমনকি যদিও ধরা হয় যে, খ্রিস্টানদের কেউ মু'মিনদেরকে ভালোবাসলো কিংবা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলো তারপরও কোন মু'মিনের জন্য জায়িয হবে না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো। যা অন্যান্য আয়াত কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

তেমনিভাবে আলিম নামধারী কোন না কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি দয়া ও ইনসাফের আচরণ করতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। (মুমতাহিনাহ্ : ৮)

তারা বলতে পারে, উক্ত আয়াত তাতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব জায়িয হওয়া প্রমাণ করে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ বাণী এবং রাসূল ﷺ এর সমূহ বিশুদ্ধ হাদীস মিলেই তো ইসলামী শরীয়ত। তাই যে কোন বিষয়ে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিকোণ জানার জন্য সে বিষয়ে নাযিলকৃত আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ বাণী এবং রাসূল ﷺ এর সমূহ বিশুদ্ধ হাদীস পরস্পর

মিলিয়ে দেখতে হবে। সুতরাং উক্ত আয়াতকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের সাথে মিলালে যে মর্ম উদ্ঘাটিত হয় তা হচ্ছে, কাফিররা মোসলমানদের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হলে অথবা মোসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের কোন ধরনের নিরাপত্তা দেয়া হলে কিংবা তাদেরকে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে শর্তসাপেক্ষ বসবাস করার অনুমতি দেয়া হলে মোসলমানরা তাদের সাথে দয়া ও ইনসাফের আচরণ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আস্‌মা' বিন্‌ত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় একদা আমার আম্মাজান মুশ্‌রিক থাকাবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে আমি এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমার মা তো ঈমানদার নন ; অথচ তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন দুনিয়ার কোন সুবিধা হাসিলের জন্য। এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সুলভ আচরণ করতে পারি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তুমি তোমার মায়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সুলভ আচরণ করতে পারো। (বুখারী, হাদীস ২৬২০ মুসলিম, হাদীস ১০০৩)

একদা 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে নববীর গেইটে একটি সিল্কের পোশাক বিক্রি হতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি যদি এ পোশাকটি কিনে জুমার দিন কিংবা বাইরের কোন প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আসলে তাদের সামনে তা পরে বেরুতেন তাহলে আপনাকে খুবই সুন্দর লাগতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ জাতীয় পোশাক এমন লোকরাই পরে যাদের আখিরাতে কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছে নেই তথা কাফির-মুশ্‌রিক। কিছু দিন পর এ জাতীয় কিছু পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি তার একটি 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে দান করলেন। তখন 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি কি আমাকে এ জাতীয় পোশাক পরাতে চাচ্ছেন ; অথচ আপনি এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে যা বলার বলেছেন তথা তা পরা হারাম করে দিয়েছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি তো তোমাকে তা পরতে দেয়নি। অতএব 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উক্ত পোশাকটি মক্কায় বসবাসরত তাঁর এক মুশ্‌রিক ভাইকে দিয়ে দিলেন। (বুখারী, হাদীস ৮৮৬ মুসলিম, হাদীস ২০৬৮)

বরং কাফিরদের সাথে এ জাতীয় দয়াময় আচরণ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করবে। উপরন্তু তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন

রক্ষা পাবে এবং তাদের মধ্যকার গরিব-দুঃখীদের প্রয়োজনও পূরণ হবে। তবে তা কখনোই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা বুঝায় না।

৪. জাতীয়তাবাদী চেতনা শরীয়ত বিরোধী হওয়ার আরেকটি মূল কারণ হচ্ছে, এ জাতীয় চেতনা কুর'আনের আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, কোন জাতীয়তাবাদী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কখনো নিজেদের রাষ্ট্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে রাজি হবে না। তখন বাধ্য হয়ে উক্ত জাতীয়তাবাদী সরকার সবাইকে খুশি রাখার জন্য নিজেদের মানব রচিত বিধানের আলোকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আর মানব রচিত বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করা মূলতঃ কুফরিই বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

অর্থাৎ অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক বানিয়ে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসঙ্কোচে তথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। (নিসা' : ৬৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

অর্থাৎ তারা কি জাহিলী যুগের বিধান চাচ্ছে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার বিধান চাইতে সুন্দর বিধান আর কে দিতে পারে? (মা'য়িদাহ্ : ৫০)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না সে তো কাফির। (মা'য়িদাহ্ : ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না সে তো যালিম। (মা'য়িদাহ্ : ৪৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না সে তো ফাসিক। (মা'য়িদাহ্ : ৪৭)

সুতরাং যে রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না এবং তা পছন্দও করে না সে রাষ্ট্র কাফির, যালিম ও ফাসিক রাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচিত হবে। প্রত্যেক মোসলমানের অবশ্যই কর্তব্য হবে এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। উপরন্তু এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে বন্ধুত্ব করা হারাম যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান বাস্তবায়ন করবে ও তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ﴾

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা এবং আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনবে। (মুম্তাহিনাহ্ : ৪)

কেউ বলতে পারে, আমরা যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মোসলমানের মাঝে কোন ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদের ব্যানারের অধীনেই সবাই একত্রিত হই তা হলে আমরা একদা এক অভূতপূর্ব শক্তিতে রূপান্তরিত হবো। তখন সবাই আমাদেরকে এক বাক্যে ভয় পাবে এবং আমাদের হৃত সমূহ অধিকার তারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

কেউ আরো বলতে পারে, আমরা যদি সত্যিকারার্থে শুধুমাত্র ইসলামকেই আঁকড়িয়ে ধরি এবং এরই ব্যানারে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হই তাহলে কাফিররা একদা আমাদের প্রতি যথেষ্ট শত্রুতা পোষণ করবে এবং তারা

সর্বদা আমাদের জন্য অকল্যাণই ডেকে আনবে। কারণ, তখন তারা এ কথা ভেবে অবশ্যই ভয় পাবে যে, একদা হয়তো-বা আমরা তাদের সাথে ধর্মীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো যাতে করে আমরা আমাদের সেই পূর্ব ঐতিহ্য ফিরিয়ে পেতে পারি।

মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই যদি নিরেট ইসলাম ও কুর'আনের ব্যানারে একতাবদ্ধ হই এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান এ জমিনের বুকে বাস্তবায়ন করি উপরন্তু কাফিরদের থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে তাদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ঘোষণা দিয়ে নিজেদের স্বকীয় অস্তিত্ব দেখাতে পারি তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তখন তিনি আমাদেরকে তাদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের অন্তরে আমাদের প্রতি প্রচুর ভয় ঢুকিয়ে দিবেন। আর তখন তারা অবশ্যই আমাদেরকে ভয় করবে এবং আমাদের সকল অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে ফিরিয়ে দিবে যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলো সে যুগের কাফিররা আমাদের পূর্ব পুরুষ মোসলমানদেরকে। সে যুগে দুনিয়ার বুকে ইহুদি-খ্রিস্টান কম ছিলো না। তবে তখন মোসলমানরা কখনোই তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতায়নি এবং নিজেদের যে কোন ব্যাপারে তাদের কোন সহযোগিতা কামনা করেনি। বরং তাঁরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছিলো এবং সর্ব ব্যাপারে তাঁরই সাহায্য কামনা করেছিলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করেছেন। কুর'আন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস এর চাক্ষুষ প্রমাণ। যা মোসলমান এবং কাফির সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

নবী ﷺ বদরের দিনে মুশ্‌রিকদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছেন। মদীনায় তখন অনেক ইহুদি ছিলো। কিন্তু তিনি তখন তাদের কারোর সহযোগিতা নেননি ; অথচ তখন মোসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিলো এবং অন্যের সহযোগিতা নেয়ারও তখন বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। তবুও রাসূল ﷺ তাদের সহযোগিতা নেননি। এমনকি তিনি উ'হুদের যুদ্ধেও ইহুদিদের কোন সহযোগিতা নেননি ; অথচ তখন মুনাফিকদের সর্দারের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা নেয়ার বিশেষ প্রস্তাব এসেছিলো। কিন্তু নবী ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মোসলমানদের জন্য কোন কাফিরের সহযোগিতা নেয়া ঠিক নয় এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে মুসলিম সেনা বাহিনীতে জায়গা

দেয়াও জায়িয নয়। কারণ, তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত নয়। বরং তারা যে কোন সূত্রে মোসলমানদের সাথে মিশে গেলে মারাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি হবে। মোসলমানদের চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফিররা মোসলমানদের মাঝে ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করারও সুযোগ পাবে। যারা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের নিয়মে চলা নিজেদের জন্য লাভজনক মনে করে না সত্যিকারার্থে অন্য কোন পদ্ধতি তাদেরকে কোন ধরনের লাভই দিতে পারবে না।

এ দিকে সকল মোসলমান শুধুমাত্র ইসলামের ব্যানারেই সঙ্ঘবদ্ধ হলে কাফিররা যে তাদের সাথে কঠিন বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করবে তা স্বাভাবিক যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। কারণ, মোসলমানরা কাফিরদেরকে শত্রু বানিয়েছে তো একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য এবং তাঁরই ধর্ম ও শরীয়তকে রক্ষা ও দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার জন্য।

মনে রাখতে হবে, কাফিররা কখনোই মোসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতা বন্ধ করবে না যতক্ষণ না মোসলমানরা তাদের মতোই কাফির হয়ে যায় এবং তাদের দলে যোগ দেয়। আর কোন মোসলমানের এমন পথ অবলম্বন করা মহা ভ্রষ্টতা ও প্রকাশ্য কুফরি বৈ কি। তেমনিভাবে তা দুনিয়া ও আখিরাতে সকল শাস্তি ও দুর্ভোগের কারণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করবে। তুমি মোসলমানদেরকে বলে দাও, আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত। তুমি যদি তোমার নিকট আসা সত্য জ্ঞানের অনুসারী না হয়ে তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো তা হলে তুমি নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করার মতো কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে পাবে না। (বাক্বারাহ্ : ১২০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ

أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾

অর্থাৎ তারা কখনোই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে পারে। যদি তাদের পক্ষে তা করা সম্ভবপর হয়। তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মচ্যুত হয়ে কাফির অবস্থায় মারা যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকল আমল নিষ্ফল বলে গণ্য হবে। উপরন্তু তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। (বাক্বারাহ্ : ২১৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি সুস্পষ্ট একটি শর'য়ী বিধানের উপর। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ করবে। কখনো মূর্খদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কারণ, তারা কখনোই তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। বরং যালিমরা একে অপরের বন্ধু। তবে আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র আল্লাহ্ভীরুদেরই বন্ধু। (জাসিয়াহ্ : ১৮-১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ জাতীয়তাবাদী চেতনার মহামারী থেকে রক্ষা করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

أهمية الجار وحقوقه

প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও অধিকার:

মানুষ বলতেই এ দুনিয়াতে কেউ একাকী বসবাস করতে পারে না। তাই আমাদের সকলকেই মানুষ হিসেবে নিজ সামাজিক জীবনে একে অপরের সাথে মিলেমিশেই থাকতে হয়। এই সুবাদে সমাজের ধনী ও শক্তিশালীরা গরিব ও দুর্বলদের অধিকার নষ্ট করতেই পারে। তেমনিভাবে সমাজের গরিব ও দুর্বলরা সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী কর্তৃক নির্যাতিত এবং নিপীড়িতও হতে পারে। তাই ইসলামী শরীয়ত সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার চিহ্নিত করেছে যা কারো কর্তৃক দলিত হলে যে কোন যুগের ইসলামী প্রশাসন কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে তা উদ্ধার করতে বাধ্য থাকবে।

প্রতিবেশী বলতে এমন সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যিনি বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মক্ষেত্রের দরুন আপনার পাশেই অবস্থান করছেন।

প্রতিবেশী আবার তিন প্রকার:

ক) যে কোন মোসলমান আত্মীয় প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি ইসলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ও প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে সর্বমোট তিনটি অধিকার পাবে। মোসলমান, আত্মীয় ও প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার।

খ) যে কোন মোসলমান অনাত্মীয় প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি ইসলাম ও প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে সর্বমোট দু'টি অধিকার পাবে। মোসলমান ও প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার।

গ) যে কোন অমোসলমান কাফির প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে একটিমাত্র অধিকার পাবে। শুধু প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার।

ইসলামে প্রতিবেশীর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সযত্ন হতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

অর্থাৎ তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। আরো ভালো ব্যবহার করো আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সাথি কিংবা সফরসঙ্গী, পথিক ও গোলাম অথবা অধিনস্থ কাজের লোকের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অহঙ্কারী আত্মাভিমানীকে ভালোবাসেন না। (নিসা' : ৩৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

অর্থাৎ জিব্রীল ﷺ বারবার আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হতে অসিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন। (বুখারী, হাদীস ৬০১৫ মুসলিম, হাদীস ২৬২৫)

২. প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা জাহিলী যুগের অভ্যাস যা পরিবর্তনের জন্য রাসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে জানা যায় হযরত জা'ফর বিন্ আবু ত্বালিবের বর্ণনা থেকে যখন তিনি সম্রাট নাজাশীর সামনে তখনকার যুগের নব ধর্ম তথা ইসলামের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন:

أَيُّهَا الْـمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْـلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الأَصْـنَامَ، وَنَأْكُـلُ الْـمَيْتَةَ وَنَـأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْـرِفُ نَسَبَهُ، وَصِـدْقَهُ، وَأَمَانَتَـهُ، وَعَفَافَـهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْـنُ وَآبَاؤُنَـا مِـنْ دُونِـهِ مِـنَ الْحِجَـارَةِ وَالأَوْثَـانِ، وَأَمَرَنَـا بِـصِدْقِ الْحَـدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَـةِ، وَصِـلَةِ الـرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالـدِّمَاءِ، وَنَهَانَـا عَـنِ الْفَـوَاحِشِ، وَقَـوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْـمُحْصَنَةِ

অর্থাৎ হে রাষ্ট্রপতি! আমরা তো ছিলাম একদা জাহিল সম্প্রদায়। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। সর্ব প্রকার অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতাম।

আমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের অধিকার হরণ করতো। আমরা এমতাবস্থায় ছিলাম। একদা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে পাঠিছেন যার বংশ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও সাধুতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ডাকলেন তাঁর একক ইবাদত ও তিনি ভিন্ন অন্য যে পাথর ও মূর্তির ইবাদত আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা করতাম তা পরিহার করতে। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলা, আমানতদারিতা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, হারাম কাজ ও রক্তপাত বন্ধ করতে আদেশ করেন এবং অশ্লীলতা, মিথ্যা কথা, এতিমের সম্পদ খাওয়া ও সতী-সাধ্বী মহিলাকে অপবাদ দিতে নিষেধ করেন। (আহ্মাদ্, হাদীস ১৭৪০)

৩. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করলে যেমন প্রতিবেশীর নিকট শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

অর্থাৎ কেউ তার সাথির নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও সে একজন শ্রেষ্ঠ সাথি রূপে বিবেচিত। আর কেউ তার প্রতিবেশীর নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও সে একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী। (তিরমিযী, হাদীস ১৯৪৪)

৪. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করা গুনাহ্ মাফের একটি বিশেষ মাধ্যম।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ، إِلاَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ

অর্থাৎ কোন মোসলমান মৃত্যু বরণ করলে তার নিকটতম প্রতিবেশী তিনটি ঘর যদি তার ব্যাপারে সত্যিকারার্থে ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমি লোকটি সম্পর্কে তার দৃশ্যমান

ব্যাপারসমূহে আমার বান্দাহ্দের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম। আর তার অদৃশ্যমান ব্যাপার সমূহ আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। যা একমাত্র আমিই জানি। আর কেউ জানে না। (আহ্মাদ্, হাদীস ৮৯৭৭)

৫. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করলে দুনিয়াতে মানুষের ভূয়সী প্রশংসা পাওয়া যায়। আর এর বিপরীতে পাওয়া যায় সমূহ লাঞ্ছনা ও তিরস্কার।

স্বনামধন্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইব্নু ইসহাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: একদা হাস্সান বিন্ সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক আরব গোত্রের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন। যারা একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু সাহাবাগণকে রাজী' নামক কুপ এলাকায় হত্যা করেছিলো। তিনি বলেন:

إِنْ سَرَّكَ الْغَـدْرُ صِرْفًـا لَا مِـزَاجَ لَـهُ فَـأْتِ الرَّجِيـعَ فَسَلْ عَـنْ دَارِ لِحْيَـانَ

قَـوْمٌ تَوَاصَـوْا بِأَكْـلِ الْجَـارِ بَيْـنَهُمْ فَالْكَلْـبُ وَالْقِـرْدُ وَالْإِنْـسَانُ مِـثْلَانِ

لَـوْ يَنْطِقُ التَّيْسُ يَوْمًـا قَامَ يَخْطُبُهُمْ وَكَـانَ ذَا شَرَفٍ فِـيهِمْ وَذَا شَـأْنِ

অর্থাৎ তোমার যদি মনে চায় কারোর নিরেট গাদ্দারি সম্পর্কে জানতে তা হলে তুমি রাজী' নামক কুপ এলাকায় গিয়ে বনী লা'হ্য়ান সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তখন তুমি জানতে পারবে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা প্রতিবেশীর অধিকার আত্মসাৎ করে। এমনকি কুকুর, বানর ও মানুষ সবই তাদের নিকট সমমর্যাদার। কখনো কোন ছাগল কথা বলতে পারলে সেই তাদের মাঝে বক্তা হিসেবে খ্যাতি পাবে। উপরন্তু সে ছাগলই হবে তাদের মধ্যকার একজন সম্মানী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। (আর-রাওযুল-উন্ফ ৩/৩৭৪)

৬. প্রতিবেশীর সাথে কোন দোষ করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্যান্যর সাথে একই দোষ করার চাইতে।

মিক্বদাদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল নিজ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

مَا تَقُولُوْنَ فِيْ الزِّنَا ؟ قَالُوْا : حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ : لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، قَالَ : فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِيْ السَّرِقَةِ ؟ قَالُوْا : حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ،

قَالَ : لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ

অর্থাৎ তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি বলো? সাহাবাগণ বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল তা হারাম করে দিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। অতঃপর রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্য দশটি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে। রাসূল ﷺ আরো বলেন: তোমরা চুরি সম্পর্কে কি বলো? সাহাবাগণ বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল তা হারাম করে দিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। রাসূল ﷺ বলেন: নিজ প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্য দশটি ঘর থেকে চুরি করার চাইতে। (আহ্মাদ্, হাদীস ২৩৯০৫)

৭. কারোর প্রতিবেশী নেককার হওয়া তার মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর বিপরীতে কারোর প্রতিবেশী বদকার হওয়া তার মহা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ : الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

অর্থাৎ চারটি জিনিস সৌভাগ্যের: নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, নেককার প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি জিনিস হচ্ছে দুর্ভাগ্যের: বদ্কার প্রতিবেশী, বদ্কার স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর ও আরামহীন বাহন। (ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪০৩২)

উপরোক্ত বিষয়সমূহ থেকে শরীয়তে প্রতিবেশীর প্রতি গুরুত্বের ব্যাপারটি সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আমাদের জানতে হবে যে, শরীয়ত প্রতিবেশীকে এমন কিছু অধিকার দিয়েছে যার প্রতি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সচেতন হলে সমাজে পরস্পর প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উপরন্তু সে সমাজ হবে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সমাজ। নিম্নে প্রতিবেশীর অধিকারগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হলো।

১. প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট না দেয়া। এটি একজন প্রতিবেশীর একান্ত প্রাপ্য। সুতরাং কেউ ঈমানের দাবি করে নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দিতে পারে না।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ

অর্থাৎ কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করলে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (বুখারী, হাদীস ৫১৮৫ মুসলিম, হাদীস ৪৭)

উপরন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلاَتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ، وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : هِيَ فِي الْجَنَّةِ

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! জনৈকা মহিলা বেশি বেশি নফল নামায, নফল রোযা ও নফল সাদাকা করে ; অথচ সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সে জাহান্নামী। লোকটি আবারো বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! জনৈকা মহিলা খুব কমই নফল নামায, নফল রোযা ও নফল সাদাকা করে ; সে কিছু পনিরের টুকরো সাদাকা করে। তবে সে নিজ মুখ দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সে জান্নাতী। (আহ্মাদ্, হাদীস ৯৬৭৩)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া অনেকভাবেই হতে পারে। তার প্রতি হিংসা করা, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও তাকে নিচু মনে করা, তার লুক্কায়িত ব্যাপারগুলো জন সমক্ষে প্রচার করা, তার ব্যাপারে মিথ্যা বলা, তার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া, তার ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করা, তার দোষে খুশি হওয়া, তাকে নিজ বাসস্থানে ও গাড়ি রাখার জায়গায় কোণঠাসা করা। তার ঘরের দরজায় ময়লা ফেলা, তার ঘরের মহিলাদের দিকে উঁকি মেরে তাকানো, বড়ো বা বিশ্রী আওয়াজ দিয়ে তাকে কষ্ট দেয়া। এমনকি তার সন্তানের ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেয়া।

কেউ নিজ প্রতিবেশী কর্তৃক কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেয়ার অভিযোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: চলে যাও। ধৈর্য ধরো। লোকটি আবারো দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এসে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: চলে যাও। নিজের ঘরের সামানগুলো রাস্তায় বের করো। লোকটি তাই করলে মানুষ তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার প্রতিবেশীর কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটি সবাইকে জানালে সবাই তাকে লা'নত তথা অভিসম্পাত দিতে শুরু করে। তারা বলতে থাকেঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার এ ক্ষতি করুক, ও ক্ষতি করুক। অতঃপর তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বললো: তুমি ঘরে ফিরে যাও। বাকি জীবন তুমি আমার পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখবে না যাতে তুমি মনে কষ্ট পাও। (আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫৩)

২. প্রতিবেশীকে মাঝে মধ্যে কোন কিছু হাদিয়া তথা উপঢৌকন দেয়া। কারণ, হাদিয়া হচ্ছে ভালোবাসার প্রমাণ। এর মাধ্যমে মানুষে মানুষে দূরত্ব কমে যায় এবং পরস্পর সম্প্রীতি ফিরে আসে।

আবু শুরাই'হ্ 'আদাওয়ী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। (বুখারী, হাদীস ৬০১৯ মুসলিম, হাদীস ৪৮)

আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

অর্থাৎ হে আবু যর! যখন তুমি ঝোল জাতীয় কোন কিছু পাকাবে তখন তাতে পানি একটু বেশী করে দিবে এবং নিজ প্রতিবেশীদের একটু খবরাখবর নিবে তথা তাদেরকে তা থেকে সামান্য কিছু হলেও দিবে। (মুসলিম, হাদীস ২৬২৫)

অতঃপর আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর ঘরে একদা একটি ছাগল যবাই করা হয়েছিলো। ঘরে এসে তিনি যখন তা জানতে পারলেন তখন তিনি নিজ ঘরের লোকদেরকে বললেন: তোমরা কি আমাদের ইহুদি

প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু হাদিয়া দিয়েছিলে? তোমরা কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু হাদিয়া দিয়েছিলে? আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

অর্থাৎ জিব্রীল ﵇ বারবার আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হতে অসিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন। (বুখারী, হাদীস ৬০১৫ মুসলিম, হাদীস ২৬২৫)

সকল প্রতিবেশীকে সর্বদা হাদিয়া দেয়া সম্ভব না হলে নিজের নিকটতম প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: আমার তো দু' জন প্রতিবেশী রয়েছে জিনিস কম হলে আমি তাদের কাকে সর্বপ্রথম হাদিয়া দেবো? তখন রাসূল ﷺ বলেন:

إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যার ঘরের দরজা তোমার সব চাইতে নিকটে। (বুখারী, হাদীস ২২৫৯)

হাদিয়া শুধু ফকির প্রতিবেশীকেই দিবে তা নয়। বরং ধনী-গরিব সকল প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে।

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ রাসূল ﷺ কে হাদিয়া দিতেন ; অথচ তিনি চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা উ'হুদ্ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিবেন বলে একদা প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। রাসূল ﷺ যেমন সুযোগ পেলেই সাহাবাগণকে হাদিয়া দিতেন তেমনিভাবে তাঁরাও তাঁকে হাদিয়া দিতেন। এমনকি হাদিয়ার উপর নির্ভর করেই রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গ মাসের পর মাস অতিবাহিত করতেন।

একদা 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁর ভাগ্নে 'উরওয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) কে বললেন:

وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِيْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ : يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟! قَالَتْ : الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! হে আমার ভাগ্নে! আমরা চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এমনকি আমরা দু' চান্দ্রমাস পেরিয়ে তৃতীয় মাসে উপনীত হতাম ; অথচ রাসূল ﷺ এর কোন স্ত্রীর ঘরেই চুলায় আগুন জ্বলতো না। তথা খানা পাকানো হতো না। 'উরওয়াহ্ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আমার খালা! তখন আপনারা কি খেয়ে জীবন যাপন করতেন। তিনি বললেনঃ দু'টি কালো জিনিস খেয়ে। তার একটি হলো খেজুর। আর অপরটি পানি। তবে রাসূল ﷺ এর কিছু আন্সারী প্রতিবেশী ছিলেন। যাঁদের ছিলো কিছু দুগ্ধবতী ছাগল। তাঁরা মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ এর জন্য ছাগলের দুধ পাঠাতেন। আর তা আমরা পান করতাম। (বুখারী, হাদীস ২৫৬৭ মুসলিম, হাদীস ২৯৭২)

এটিই হচ্ছে প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেয়ার সুন্নাত। তা না হলে একদা আপনার প্রতিবেশীই কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ، هَـذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنِيْ، فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ

অর্থাৎ বহু প্রতিবেশী তো এমন রয়েছে যারা নিজ প্রতিবেশীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে ধরে বলবেঃ হে আমার প্রভু! এ লোকটি আমার চোখের সামনে তার বাড়ির গেইটটি বন্ধ করে দিলো। সে আমাকে এতটুকুও দয়া করেনি। সে আমাকে কিছুই দেয়নি। (বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১১১)

৩. নিজের জন্য যা ভালোবাসবে নিজ প্রতিবেশীর জন্যও তা ভালোবাসবে। সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করবে। তাকে কোন ভাবেই হিংসা করবে না।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন তথা আল্লাহ্

তা'আলার কসম! কোন বান্দাহ্ সত্যিকারার্থে মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশী কিংবা যে কোন মোসলমান ভাইয়ের জন্য তা ভালোবাসবে যা নিজের জন্য সে ভালোবাসে। (মুসলিম, হাদীস ৪৫)

৪. যথাসাধ্য নিজ প্রতিবেশীর পার্থিব যে কোন প্রয়োজন পূরণে তাকে সহযোগিতা করবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ، قَالَ : ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْـرَةَ : مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ তার প্রতিবেশীকে তার নিজ দেয়ালে প্রয়োজনে কোন কাঠের টুকরো গাড়তে চাইলে তাকে তাতে কোন বাধা দিবে না। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমি কেন তোমাদেরকে এ কাজে অনীহা প্রকাশ করতে দেখছি? আল্লাহ'র কসম! আমি অবশ্যই কাঠের টুকরোগুলো তোমাদের কাঁধে নিক্ষেপ করবো। (মুসলিম, হাদীস ১৬০৯)

সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) নিজ প্রতিবেশীর সহযোগিতার ব্যাপারে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার দরুন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি একদা আশ্'আরী গোত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন:

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْـمَدِيْنَةِ جَمَعُـوا مَـا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْـنَهُمْ فِي إِنَـاءٍ وَاحِـدٍ بِالـسَّوِيَّةِ فَهُـمْ مِنِّـي وَأَنَا مِنْهُمْ

অর্থাৎ আশ্'আরী গোত্রের লোকদের এমন সুন্দর অভ্যাস যে, তারা যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের নিজেদের মধ্যকার খাদ্য দ্রব্য শেষ হওয়ার উপক্রম হলে অথবা মদীনায় তাদের পরিবারবর্গের খাদ্য দ্রব্য কমে গেলে তারা নিজেদের নিকট মজুদ থাকা সকল খাদ্য দ্রব্য একটি কাপড় বা চাদরে একত্রিত করে কোন বাটি বা পাত্র দিয়ে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ

করে নেয়। তারা আমার এবং আমিও তাদেরই একজন। (বুখারী, হাদীস ২৪৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৫০০)

৫. নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রী, সন্তান ও সম্মানের হেফাযত করবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনা যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (মুসলিম, হাদীস ৪৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সব চাইতে বেশি মারাত্মক? তিনি বললেন:

أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

অর্থাৎ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ বা শরীক বানানো ; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম: অতঃপর কি? তিনি বললেন: নিজ সন্তানকে হত্যা করা তোমার সাথে খাবে বলে। আমি বললাম: তারপর কি? তিনি বললেন: নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। (বুখারী, হাদীস ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২ মুসলিম, হাদীস ৮৬)

৬. নিজ প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখী হবে এবং তাকে কোনভাবেই চিন্তিত ও ব্যথিত করবে না। বিশেষ করে প্রতিবেশীটি বেশি বয়স্ক হলে।

ইমাম যাহাবী বলেন: আমি মুহাম্মাদ বিন্ হামিদ বায্যার থেকে শুনেছি তিনি বলেন: আমরা একদা আবু হামিদ আ'মাশীকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমি বললাম: আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন: আমি তো ভালোই আছি। তবে আমার প্রতিবেশী আবু হামিদ জালূদী আমাকে চিন্তিত করেছে। সে গতকাল আমার সাক্ষাতে আসলো। তখন আমি আরো বেশি অসুস্থ ছিলাম। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো: হে আবু হামিদ! আমি খবর পেয়েছি "যান্জাওয়াই" মৃত্যু বরণ করেছে। আমি বললাম: আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দয়া করুন। সে আবারো বললো: আমি আজ "মুআম্মিল্ বিন্ হাসানের নিকট গিয়েছিলাম। তখন সে তার শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করছিলো। সে আবারো বললো: হে আবু হামিদ!

আপনার বয়স কতো? আমি বললাম: আমার বয়স ৮৬ বছর। তখন সে বললো: তাহলে আপনি আপনার পিতার চাইতেও বেশি বয়স পেয়েছেন। আমি বললাম: আমি তো আল্-'হাম্দুলিল্লাহ্ সুস্থই আছি। আমি তো গত রাত এ এ কাজ করেছি। আজও এ এ কাজ করেছি। তখন সে লজ্জিত হয়ে চলে গেলো। (সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা' ১৪/৫৫৪)

আমরা আজ থেকে চেষ্টা করবো আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি অধিকার আদায় করতে এবং তার সাথে থাকা পূর্বেকার সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেতে। আর সব সময় এ চেষ্টা করবো যে, যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে এমন কোন কিছু না ঘটে যাতে করে আমাদের মধ্যকার সুসম্পর্কটুকু নষ্ট না হয়ে যায়। এমনকি কারোর সঙ্গে তার প্রতিবেশীর ঝগড়া হলে তা অতি সত্বর মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এভাবে বাকি জীবনটুকু পরিচালনা করার তাওফীক দান করুন। আ'মীন।

সমাপ্ত

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ | পৃষ্ঠাঃ